স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৫ম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০১৫-২০১৬

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে ও দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু
বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক) পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

ডায়াবেটিস সম্পর্কে জানার কথা
অল্পতেই দুর্বল লাগছে? ডায়াবেটিস হতে পারে। এ রোগের চেনা লক্ষণগুলো হল বারবার প্রস্রাব হওয়া আর খিদে-তেষ্টা বেড়ে যাওয়া। কিন্তু সবসময় তা হয় না। এ দেশে ডায়াবেটিস এখন মহামারী, আর তার নানা জটিলতায় জীবনহানি পর্যন্ত হতে পারে। সময়ে চিকিৎসা করলে কিন্তু বাঁচা যায়।
লিখেছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ (২০)

আমাদের দেশে ফ্লুরাইড-বিষণ ভয়াবহ। ফ্লুরাইড আসে মূলত মাটির তলার জল তোলা থেকে, পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে এর কোনো কমতি নেই। হাড় ও দাঁতের কঠিন রোগ তৈরি করে ফ্লুরাইড। প্রায় সব টুথপেস্টেই ফ্লুরাইড থাকে। ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও আমরা টুথপেস্টে ফ্লোরাইড দিচ্ছি। আমেরিকা ও নানা দেশ জলে ফ্লুরাইড মেশাচ্ছে। ফ্লুরাইড সম্পর্কে লিখেছেন—
ফ্লুরাইড দূষণ ও স্বাস্থ্যহানি: ডা. জয়ন্ত দাস (৪)
ফ্লুরাইড দূষণ: এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র: অহনা মল্লিক। (৮)

মাথা ঘুরলে ব্লাড প্রেশারের ওষুধ বন্ধ?
মাথা ঘুরলে ঝট করে ব্লাডপ্রেসারের চালু ওষুধ বন্ধ করার একটা বিপজ্জনক প্রবণতা খুব দেখা যাচ্ছে। মাথা ঘোরা জিনিসটা কষ্টের, কিন্তু আতঙ্কের নয়। রক্তচাপ কতোটা বাড়লে কোন ওষুধ কী ডোজে দেওয়া হবে তার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ পরিবর্তন করবেন না।
লিখেছেন ডা. গৌতম মিস্ত্রী। (৩৪)

পেটে ব্যথা
কোনোদিন পেটে ব্যথা হয়নি, এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু সব পেটব্যথা সমান নয়। কোনোটা সারে এমনি এমনি, কোনোটাতে ওষুধ চাই-ই চাই, আবার কোনোটাতে অপারেশন ছাড়া গতি নেই।
লিখেছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ। (৩৬)

রিউম্যাটিক জ্বর ও রিউম্যাটিক হার্টের রোগ
মামুলি গলা ব্যথা আর জ্বর—আপনি হয়তো পাত্তাই দিলেন না। কিন্তু পরে এর থেকেই হতে পারে হৃদযন্ত্রের কঠিন অসুখ। কীভাবে চিনবেন এই রিউম্যাটিক জ্বর?
লিখেছেন ডা. কুশল সেন। (৪৫)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

ফ্লুরাইড দূষণ ও স্বাস্থ্যহানি: ডা. জয়ন্ত দাস ৪

ফ্লুরাইড দূষণ: এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র: অহনা মল্লিক ৮

ভারতীয় লোকভেষজবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা:
মানবেন্দ্র রায় ১৩

মানবিকতার আয়নায় মৃত্যুদণ্ড: রুমঝুম ভট্টাচার্য ১৭

ডায়াবেটিস সম্পর্কে জানার কথা: ডা. পুণ্যব্রত গুণ ২০

চেনা ওষুধ অজানা কথা
অ্যাটেনোলল ২৪

অধিকার ছিনিয়েই নিতে হয়: সৌম্য সেনগুপ্ত ২৫

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে: মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন ৩০

মারবে কেন তবে: এষা মিত্র ৩১

সুপ্রিম কোর্ট বাণিজ্যিক সারোগেসি নিষেধের ইঙ্গিত দিলেন ৩৩

মাথা ঘুরলে ব্লাড প্রেশারের ওষুধ বন্ধ? ডা. গৌতম মিস্ত্রী ৩৪

পেটে ব্যথা: ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৩৬

টুকরো খবর
রোগ নির্ণয়ে ৩ডি প্রিন্টেড 'ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ' ৩৯
এফডিএ ৩ডি প্রিন্টেড ওষুধকে স্বীকৃতি দিল ৪০
অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে ভারত পৃথিবীতে এক নম্বরে ৪২
মানুষরে চেয়ে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক পায় পশুপাখি ৪৩
দ্রুত ছড়াচ্ছে সুপার বাগ ৪৪

রিউম্যাটিক জ্বর ও রিউম্যাটিক হার্টের রোগ: ডা. কুশল সেন ৪৫

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার
কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন ২০০২ (তৃতীয় অংশ)
অনুবাদ: দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮

যে আঘাত সবার: অনীক চক্রবর্তী ৫১

শব্দ-ছক-২
প্রস্তুতি: রুচিরা মজুমদার ৩২

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল	কলকাতার অন্যত্র
পাতিরাম	অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
বুকমার্ক	এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
পিপলস বুক সোসাইটি	লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
বই-চিত্র	কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
মনীষা গ্রন্থালয়	বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট	দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৮৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৮৯২৬২৮৬২৬৪)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'*-র গ্রাহক হোন।**

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-এর মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

১.

গরিবের ঘোড়ারোগ : ডায়াবেটিস এক মহামারীর আকার নিতে চলেছে।

কয়েক দশক আগে ধারণা ছিল যে ডায়াবেটিস মেলিটাস সচ্ছল মানুষদের রোগ। মনে করা হত যাঁরা শারীরিক শ্রম করেন না ভালোমন্দ খান তাঁদেরই ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি। অবস্থাটা বদলেছে, সমাজের নীচুতলার মানুষরাও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। অমাদের মতো দেশের গরিব মানুষদের খাদ্যে প্রোটিন অর্থাৎ আমিষ ও প্রাণশক্তির অভাবে এবং খাবারে শ্বেতসার জাতীয় খাবার বেশি থাকায় ইনসুলিন উৎপাদনকারী অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলো ক্রমশ খারাপ হতে হতে শেষ অবধি নষ্ট হয়ে গিয়ে ডায়াবেটিস হচ্ছে বলে ধারণা। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে দেশের ৬ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিসের শিকার, ২০৩০-এ এই সংখ্যা বেড়ে ১০ কোটি ১০ লক্ষ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ডায়াবেটিস আজ কেবল বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার বিষয় নয়, জেনারেল ফিজিশিয়ানদেরও আজ ডায়াবেটিসের চিকিৎসা জানতে হচ্ছে। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম এবং প্রয়োজনে ওষুধ এ ছাড়াও রোগ সম্বন্ধে রোগীর জানা ডায়াবেটিস চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ডায়াবেটিস রোগটা কী, এ থেকে কী কী জটিলতা হতে পারে, লাগাতার ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকা কেন গুরুত্বপূর্ণ—ইত্যাদি ডায়াবেটিস রোগীর জানা দরকার। বোঝা দরকার ডায়াবেটিসের ওষুধ খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ বা ব্যায়ামের বিকল্প নয়। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠক-পাঠিকাদের এই রোগ সম্বন্ধে জানানোর প্রয়াস থাকছে এই সংখ্যায়।

২.

ফ্লুরাইড বিষণ, স্বল্প-মাত্রায় ফ্লুরাইডের পক্ষে ওকালতি

খবরের কাগজে লেখালিখিও কম, মানুষের অজানা হলেও ভারতবর্ষে আর্সেনিক-বিষণের চাইতে ফ্লুরাইড-বিষণ বেশিদিন ধরে আছে। ফ্লুরাইড-বিষণ কিছু কম ভয়াবহ নয়, আর্সেনিকের মতো এটাও এসেছে মূলত ভূ-জল থেকে। আর্সেনিক নিয়ে তাও কিছুটা সচেতনতা চোখে পড়ে, কিন্তু ফ্লোরাইড নিয়ে মানুষ বিশেষ জানেন না। পানীয়জল থেকে আর্সেনিক-বিষণ-এর প্রথম রোগী ধরা পড়ে ১৯৮২ সালে। তুলনায় ১৯৩০-এর দশকে অন্ধ্রপ্রদেশের নালগোন্ডায় পানীয় জল ও অন্যান্য উৎস থেকে আসা ফ্লুরিন থেকে দীর্ঘমেয়াদি ফ্লুরাইড-বিষণ নজরে আসে, ১৯৩৭ সালে এ বিষয়ে প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়; কিন্তু এখনও সেখানে পানীয় জলে ফ্লুরাইড-বিষণের সমাধান হয়নি। আর্সেনিক নিয়ে কাজ না হোক, হইচই বেশ খানিকটা হয়েছে। কিন্তু ফ্লুরাইড নিয়ে সেটাও হয়নি।

ফ্লুরাইড-বিষণ চেনা যায় প্রথমে 'বিচিত্রিত' এবং শেষে নষ্ট হয়ে যাওয়া দাঁত দেখে। এ ছাড়া আছে কঙ্কালতান্ত্রিক ফ্লুরোসিস। স্বাভাবিক হাড়ের বদলে যত্রতত্র টিউমারের মতো শক্ত পিণ্ড, বা খোঁচা খোঁচা তৈরি হয়, টেন্ডন, লিগামেন্ট, কার্টিলেজে অস্বাভাবিক ক্যালশিয়াম জমে শক্ত হয়ে যায়। ফলে নড়তে-চড়তে ব্যথা, সহজে হাড় ভাঙা, কুঁজো হয়ে যাওয়া ও কম বয়সে পঙ্গুত্ব।

আশ্চর্য হল, আমাদের দেশে চালু প্রায় সব টুথপেস্টেই 'দন্তক্ষয় নিবারণে' ফ্লুরাইড যোগ করা হয়। সেটা থেকে কিছুটা ফ্লুরাইড দেহে ঢোকে, এবং যেসব অঞ্চলে জলে ফ্লুরাইড আছে এখানে এটা ফ্লুরোসিস-এর একটা অতিরিক্ত কারণ হতেও পারে। এ ছাড়া এই টুথপেস্ট টিউব ধরে খেয়ে ফেললে ফ্লুরাইডের তীব্র বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেবে; এমনকী এক টিউব টুথপেস্ট একজন শিশুকে মেরে ফেলতেও পারে।

কিছু বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণায় জীবদেহে ফ্লুরাইডের উপস্থিতি লক্ষ করে সিদ্ধান্ত নেন যে সামান্য মাত্রায় ফ্লুরাইড জীবদেহে অত্যাবশ্যক। তাঁদের সমালোচক বিজ্ঞানীরা বলেন, তাহলে তো সিসা, পারদ, আর্সেনিককেও জীবদেহে অত্যাবশ্যক বলতে হয়, কেননা এগুলোও জীবদেহে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

সামান্য মাত্রায় ফ্লুরাইড মানবদেহে ভালো, এমন একটা কথা চালু করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু সেটার পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি কম বলেই মনে হয়। পানীয় জলে ফ্লুরাইড যোগ করার কট্টর সমর্থক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মাস-ছয়েক আগে জলে গ্রহণযোগ্য ফ্লুরাইড-মাত্রা কমিয়ে দিল, কেননা যে পরিমাণ ফ্লুরাইডযুক্ত জল সেখানে খাওয়ানো হয়েছে তার ফলে শতকরা ২০ ভাগ মানুষের দাঁতের ফ্লুরোসিস হয়েছে! এতদিন এমন ক্ষতিকর মাত্রা কেমন করে চালু ছিল? আসলে আমেরিকা, বা বলা ভালো, সে দেশের 'মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'-এর কাছে ফ্লুরাইডকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করা খুব দরকার। নইলে অ্যাটম বোমা তৈরি, ধাতুশিল্প ইত্যাদিতে যে পরিমাণে ফ্লুরাইড-দূষণ হয়েছে, আমেরিকার সাধারণ মানুষকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হলে সরকার ও বড়ো শিল্পপতিরা দেউলিয়া হয়ে যাবে।

আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বের প্রায় সব দেশের শাসকেরা বহুদিন যাবৎ ফ্লুরাইড নিয়ে বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করতে চাইছে। সবথেকে চালু কায়দাটা হল, বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে প্রভাবিত করা, ও সেই গবেষণার জোরে বলা, কম মাত্রায় ফ্লুরাইড মানবশরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এইভাবে জনমত গঠন করে, 'ফ্লুরাইড দন্তক্ষয় রোধ করে', এমন প্রচার চালিয়ে, টুথপেস্টে ফ্লুরাইড দিয়ে, কিছু কিছু দেশে 'জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে' পানীয় জলে ফ্লুরাইড যোগ করে, ফ্লুরাইডকে নির্দোষ সাজানো হচ্ছে—এ সন্দেহ অমূলক নয়। এরপর যেকোনো মাত্রায় ফ্লুরাইড ক্ষতিকর—এমন প্রমাণ হলেও 'মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'-কে দোষ দেওয়া যাবে না। তারা বলবে ফ্লুরাইড খারাপ জিনিস বলে জানা ছিল না, সুতরাং সেটা থেকে ক্ষতি হয়ে থাকলেও, বড়োশিল্প বা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদকদের এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই।

ফ্লুরাইড নিয়ে আলোচনায় তাই বিশ্ব-রাজনীতি একেবারে না ঢুকিয়ে উপায় নেই। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠক কী বলেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

ফ্লুরাইড দূষণ ও স্বাস্থ্যহানি

আমাদের দেশে ফ্লুরিন বা ফ্লুরাইড-জ২িনত দীর্ঘমেয়াদি বিষণ আর্সেনিকের চাইতে প্রাচীন, এবং কিছু কম ভয়াবহ নয়। আর্সেনিকের মতো ফ্লুরাইডও এসেছে মূলত ভূ-জল উত্তোলনের হাত ধরে, আর ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে এর প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট হলেও তথ্য বড়ো কম—লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

আর্সেনিক বিষণজনিত মহামারীর রূপ গবেষক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হাত ধরে সাধারণ মানুষের সামনে গত ত্রিশ বছর ধরে দুই বাংলায় আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছে, ফ্লুরাইডের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়নি। আমাদের প্রায় অলক্ষেই ঘটে চলছে এই মহামারী। আর্সেনিক নিয়ে ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, কিছুটা সচেতনতা চোখে পড়ে; যদিও তা সত্ত্বেও আর্সেনিক দূর করার জন্য সরকার যথাযথ কাজ করেছেন, সে কথা মোটেই বলা যায় না। কিন্তু ফ্লোরাইড নিয়ে মানুষ খুব বেশি জানেন না, খবরের কাগজে লেখালিখিও তুলনায় কম। আর সরকারি কাজকর্মের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। অথচ আর্সেনিকোসিস ভারতে তুলনায় নবাগত, ১৯৮২ সালে প্রথম কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল ডিজিজ-এ আর্সেনিকোসিস-এর রোগী ধরা পড়ে। আর ১৯৩০-এর দশকের প্রথমদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের নালগোন্ডায় ফ্লুরোসিস (অর্থাৎ পানীয় জল ও অন্যান্য উৎস থেকে আসা ফ্লুরিন থেকে দীর্ঘমেয়াদি ফ্লুরাইড-বিষণ) নজরে আসে। এ বিষয়ে প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। তারপর এখানে অনেক দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী ফ্লুরাইড দূষণ নিয়ে কাজ করেছেন। নালগোন্ডার ফ্লুরোসিস জগৎ-কুখ্যাত। কিন্তু এখনও সেখানে মানুষ ফ্লুরোসিসে ভুগছেন, এমনকী পানীয় জলে ফ্লুরাইড-বিষণের সমাধান আজও হয়নি। আর্সেনিক নিয়ে কাজ না হোক, হইচই বেশ খানিকটা হয়েছে। কিন্তু ফ্লুরাইড নিয়ে সেটাও হয়নি। কেন হয়নি তা জোর দিয়ে বলা মুশকিল, তবে কিছুটা অনুমান করা যায়। আমরা সে প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রেখে দেখতে চেষ্টা করব, ভারতে ফ্লুরাইড দূষণ কেমন, ও সেই কারণে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি কতটা হচ্ছে।

ফ্লুরাইড দূষণ এ দেশে কোথায়?

ভারতের ফ্লুরাইড-দূষণ মানচিত্রটি এখনও সম্পূর্ণ নয়। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, পানীয় জলে ১ মিলিগ্রাম/লিটার হল ফ্লুরাইডের ঊর্ধ্বসীমা। সেই হিসেবে বহু অঞ্চলেই ফ্লুরাইড বেশি, তার ওপর আবার রয়েছে চা, টুথপেস্ট ও অন্যান্য উৎস থেকে আসা ফ্লুরাইড। ফ্লুরোসিস রোগের বিস্তার নিয়েও আমাদের তথ্য অপ্রতুল। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ-এর রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ২০-টিতে ফ্লুরোসিস আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট ও রাজস্থানে শতকরা ৭০ ভাগ বা তার বেশি জেলায় ফ্লুরোসিস আছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লির শতকরা ৪০ থেকে ৭০ ভাগ জেলায় ফ্লুরোসিস আছে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, ছত্তিশগড়ে শতকরা ১০ থেকে ৪০ ভাগ জেলায় ফ্লুরোসিস আছে।

তবে শুকনো হিসেব থেকে ফ্লুরোসিসে আক্রান্তদের ক্ষয়ক্ষতি বোঝার চেষ্টা করা বৃথা। কয়েকজন ফ্লুরোসিসের শিকার নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

''. . . রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলে ফ্লুরাইডের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। এই ব্লকে ১২৬টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে প্রতি লিটার জলে ১৭.৯ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড রয়েছে। . . . খয়রাশোলে প্রতি লিটার জলে ১৫.৯ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড রয়েছে। সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে প্রতি লিটার জলে ফ্লুরাইডের মাত্রা প্রায় ২.৫৬ মিলিগ্রাম। পাশাপাশি নলহাটি, রাজনগর, ময়ূরেশ্বর ও সাঁইথিয়া ব্লকের মাটির নীচের জলেও ফ্লুরাইড।
ভূবিজ্ঞানী . . . বলেন . . . বীরভূম জেলায় যেমন জলস্তর নেমে যাচ্ছে তেমনই বাড়ছে ফ্লুরাইডের মাত্রা।'' *একদিন পত্রিকা*, ৯ মার্চ, ২০১১।

''নয়াদিল্লির এক-তৃতীয়াংশ ভূগর্ভজলই ফ্লুরাইড বিষিত। ফ্লুরাইড বিষে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।'' —*টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ২৯ জুন, ২০০৪।

''নালগোন্ডা হল দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের অত্যন্ত দরিদ্র খরাপীড়িত অঞ্চল। এখানকার প্রতি লিটার জলে ১০ থেকে ১২ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড রয়েছে। শরীরের অস্থিতে পঙ্গুত্ব, কুব্জতা, বেঁকা হাত-পা, দাঁতের বিকৃতি, দৃষ্টিহীনতা ও নানা শারীরিক সমস্যা নিয়ে মানুষ সর্বত্র দেখা যায়। রামস্বামীর কাহিনিটি বেদনাদায়ক ও শোকাবহ। ১৮ বছর বয়সি আর সব যুবকেরা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, আর রামস্বামীকে দেখলে মনে হয় পাঁচ বছর বয়স। সে এত দুর্বল যে হাঁটতেই পারে না। ওজন মাত্র ১৫ কেজি। সে চোখেও দেখতে পায় না, আর মানসিক প্রতিবন্ধী। নিজের নাম বলতে পারে না সে, নিজের খাবারও খেতে পারে না। তার বাবা রামলিঙ্গাইয়া নিজে ফ্লুরোসিসে আক্রান্ত, তিনি বলেন, 'আমাদের সাধ্যমতো সবকিছুই করেছি।''—*বিবিসি নিউজ*, ৭ এপ্রিল, ২০০৩।

অকাল বার্ধক্যে ন্যুব্জ বাবলু মাস্টার ও গ্রামের অন্য লোকেরা জীবন দিয়ে জানেন ফ্লুরাইড কী। বাবলু মাস্টারের ৭/৮ জন ভাইবোন ফ্লুরাইড বিষক্রিয়ায় আগেই গত হয়েছিল

''আমার প্রথম ফ্লুরাইড শিক্ষক হলেন 'বাবলু মাস্টার'। বাঁকা পিঠ, অকাল বার্ধক্যে ন্যুব্জ বাবলু মাস্টার ও গ্রামের অন্য লোকেরা জীবন দিয়ে জানেন ফ্লুরাইড কী। বাবলু মাস্টারের ৭/৮ জন ভাইবোন

ফ্লুরাইড বিষক্রিয়ায় আগেই গত হয়েছিল। জীবিত একমাত্র দিদি, তাঁরও বাঁকা পিঠ, নড়তে চড়তে ব্যথা বেদনা। দু-বছর পরে গিয়ে দেখলাম বাবলু মাস্টার আর নেই।"— মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার। *পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪।

অধ্যাপক মজুমদার তাঁর উপরোক্ত পুস্তকে আরও জানাচ্ছেন, বীরভূমের নলহাটির কাছে নসিপুর গ্রামে শিশু কিশোর সবার দাঁত হলুদ বাদামি কালো ছোপ আর গর্তে ভরা। একটু বয়স্করা অকালবার্ধক্যে আক্রান্ত, কুব্জ, নড়তেচড়তে গায়ে ব্যথা, অনেকে শুয়েই থাকেন দিনরাত, এবং অকালে মারা যান। নলকূপের জলে ফ্লুরাইডের মাত্রা ১৬ মিলিগ্রাম/লিটার। পুরুলিয়ার খইরি গ্রাম তুলনায় ভাগ্যবান, ফ্লুরাইড ৮ মিলিগ্রাম/লিটার, মানুষজন দাঁত ও হাড়ের ফ্লুরোসিস-এ আক্রান্ত। আর পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্যে ভাগলপুরের কাছে কোলাকুর্দ গ্রাম বিভূতিভূষণের *আরণ্যক*-এর বর্ণিত স্বপ্নভূমির এক অংশ। লোকসংখ্যা এখনও অল্প, কিন্তু তার বেশিরভাগ ফ্লুরোসিস-এর রোগী। অধ্যাপক মজুমদারের মতে, আর্সেনিকোসিস-এর মতো ফ্লুরোসিসও ভারতে ব্যাপকভাবে এসেছে ১৯৭০ সালের পর থেকে—যখন নলকূপ বসিয়ে জীবাণুমুক্ত পানীয় জল ও সেচের জল আহরণ করার প্রচলন ব্যাপ্তি পেল।

ক্রনিক ফ্লুরাইড বিষণের উপসর্গ ও লক্ষণ

আর্সেনিক বিষণের রোগ-নির্ণয়কারী লক্ষণ যেমন দেখা দেয় চামড়ায়, তেমন ফ্লুরাইড বিষণের রোগ-নির্ণয়কারী লক্ষণ দেখা যায় দাঁতে। বিচিত্র দাঁত দেখেই ফ্লুরোসিস সন্দেহ করে, নিশ্চিত রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করতে হয়। দাঁতের এনামেল, ডেন্টিন ও সিমেন্টাম, একে একে সবগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাঁতের ওপর হলুদ, বাদামি ও কালো ছোপ পড়ে, মাঝে মাঝে দাঁতের ওপর ভাঙা দাগ বা গর্তও দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত দাঁতগুলো একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়, মাটী দিয়েই খেতে হয়।

এ ছাড়া আছে কঙ্কালতান্ত্রিক ফ্লুরোসিস। হাড়ের যে কোষগুলো হাড়ের নিত্যনৈমিত্তিক পুনর্গঠনের জন্য কোলাজেন তৈরি করে, ফ্লুরাইড তাদের কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে স্বাভাবিক হাড়ের বদলে যত্রতত্র টিউমারের মতো পিণ্ড, বা খোঁচা খোঁচা 'স্পাইক' তৈরি করে। হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা তন্তুময় কোলাজেন কলা, যেখানে ক্যালশিয়াম জমে শক্ত হয়ে যাবার কথা নয়, সেখানে (টেন্ডন, লিগামেন্ট, কার্টিলেজ) ক্যালশিয়াম জমে যায়, আবার হাড়ের স্বাভাবিক ক্যালশিয়াম জমানো বাধা পায়। ফলে অঙ্গসঞ্চালনে ব্যথা হয়, সহজে হাড় ভাঙে, বিশেষ করে কম বয়সে 'হিপ ফ্র্যাকচার' হবার ফলে মানুষ পঙ্গু হয়ে যান। আবার মেরুদণ্ডের টেন্ডন, লিগামেন্ট, কার্টিলেজে অস্বাভাবিক ক্যালশিয়াম জমা হবার ফলে মানুষ কুঁজো হয়ে যান, এটাও তাকে পঙ্গু করে দেয়। ওষুধ দিয়ে বা অপারেশন করেও এঁদের সারানো যায় না। কঙ্কালতান্ত্রিক ফ্লুরোসিসের প্রথম অবস্থায় ফ্লুরাইডমুক্ত জল ও খাবার দিতে পারলে রোগ অনেক কমে যায়, সেরেও যেতে পারে। রোগ এগিয়ে গেলে কিছুতেই বিশেষ কাজ হয় না।

আমেরিকা, ফিনল্যান্ড, চীনসহ পৃথিবীতে অনেক জায়গায় দেখা গেছে জলে ফ্লুরাইড সামান্য দূষণ বাড়লেই হিপ ফ্র্যাকচারের সংখ্যা বাড়ে; অস্টিওআথ্রাইটিসের সংখ্যাও বাড়ে বলে অনেকে দাবি করেন। গ্রেটার দিল্লির পানীয় জলে ফ্লুরাইডযুক্ত নলকূপের জল মেশনো হয়। কিছু বিজ্ঞানীর অভিমত, দিল্লিতে সেজন্যই স্পন্ডিলাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এ নিয়ে আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে।

দিল্লির এইমস-এর ডা. এ কে সুশীলা গবেষণা করে দেখিয়েছেন, জলে ফ্লুরাইড যেখানে আছে সেখানে প্রসূতি মায়ের রক্তাল্পতা, গর্ভপাত অনেক বেশি। পুরুষদের শুক্রাণু সংখ্যায় কমে যায় ও অস্বাভাবিক হয়ে যায়। যেখানে জলে ফ্লুরাইড বেশি সেখানে এমনকী অল্প বয়সি মায়েদের সন্তানের ডাউন'স সিনড্রোম বেশি দেখা দেয় (সাধারণত মায়ের বেশি বয়সে সন্তান হলে ডাউন'স সিনড্রোম বেশি হয়)। ফ্লুরাইড শিশুদের বুধ্যঙ্ক কমিয়ে দেয় বলে অনেক গবেষক দেখিয়েছেন। ফ্লুরাইড থাইরয়েড গ্রন্থির কাজে বিঘ্ন ঘটায়। ছোটোবেলায় থাইরয়েডের কাজ ব্যাহত হলেও বুদ্ধি কমে যায়। অ্যালুমিনিয়ামকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেবার কাজে সহায়তা করে ফ্লুরাইড, আর তাতে অ্যালঝাইমারস রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, আর্সেনিক-জনিত মানবদেহের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ঐক্যমত বেশি, সেখানে 'অনেক গবেষক দেখিয়েছেন' বলে আর্সেনিক কুপ্রভাবের উল্লেখ করতে হয় না। ফ্লুরাইডের ক্ষেত্রে সেটা করতে হয়। তার কারণ লুকিয়ে রয়েছে কিছু বিশেষ শিল্প ও সমর-রাজনীতিতে ফ্লুরাইড-এর ব্যবহার করার ইতিবৃত্তে। তাই ফ্লুরাইড নিয়ে সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে তা অনেকাংশে রাজনীতির বিবরণ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র এই সংখ্যায় অন্যত্র যোগ্যতর লেখক সেটা করেছেন।

ফ্লুরাইডের অন্যান্য উৎস

আগেই দেখেছি, এ দেশে পানীয় জলে ফ্লুরাইডের ব্যাপ্তি নিয়ে আমাদের খুব ভালো হিসেব নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, পানীয় জল ছাড়াও ফ্লুরাইডের গুরুত্বপূর্ণ উৎস রয়েছে। তার দু-একটি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট চিন্তার কারণ। কিন্তু সেগুলো নিয়েও সরকারিস্তরে পরিসংখ্যান অপ্রতুল, উদাসীনতা অসীম।

ক. চা-এ ফ্লুরাইড ও অ্যালুমিনিয়ামের ক্রমসঞ্চয় হয়। চা বাগানের মাটিতে ও জলে ফ্লুরাইড থাকলে চা পাতায় সেই মাটি বা জলের চাইতে অনেক বেশি মাত্রায় ফ্লুরাইড জমে। এমনও দেখা গেছে যে ফ্লুরাইডদূষিত অঞ্চলে চা পাতায় তৈরি এক কাপ চায়ে ৭ থেকে ৮ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড আছে। অর্থাৎ সেই চা এক কাপ পান করলে ১ মিলিগ্রাম/লিটার ফ্লুরাইডযুক্ত ৭ থেকে ৮ লিটার জল পান করার সমান ক্ষতি হতে পারে। এবং সেই ফ্লুরাইড শরীরে শোষণযোগ্য হলে তীব্র বিষক্রিয়াও অসম্ভব নয়। তিব্বতে শিশুদের মধ্যে ফ্লুরোসিসের প্রাদুর্ভাবের মূল কারণই হল অতিরিক্ত লাল চা পান, চিলিতেও তাই। লাল চায়ের ফ্লুরাইড দেহে সহজে শোষিত হয়, দুধ দেওয়া চায়ে তা হয় না তাই ফ্লুরাইড অধ্যুষিত এলাকায় চা না খাওয়াই

ভালো, খেলে দুধ দেওয়া চা মন্দের ভালো।

খ. আমাদের দেশে চালু প্রায় সব টুথপেস্টেই 'দন্তক্ষয় নিবারণে' ফ্লুরাইড যোগ করা হয়। সেটা থেকে মুখের মধ্য দিয়ে আমাদের দেহে কিছুটা ফ্লুরাইড ঢোকে, এবং যেসব অঞ্চলে জলে ফ্লুরাইড আছে এখানে এটা ফ্লুরোসিস-এর একটা অতিরিক্ত কারণ হতেও পারে। খুব চালু এক 'অ্যান্টিক্যাভিটি' টুথপেস্টে ফ্লুরাইড থাকে ১০০০ পিপিএম (প্যাকেটের ভাষায়, '1000 ppm available fluoride when packed')। পিপিএম পুরো কথাটা হল পার্ট পার মিলিয়ন, অর্থাৎ এক মিলিয়ন, বা দশ লক্ষ ভাগে একভাগ ফ্লুরাইড। প্রথম নজরে মনে হতে পারে নেহাত অল্প, কিন্তু একটু খতিয়ে দেখা যাক। ১ পিপিএম মানে এক কেজি টুথপেস্টে ১ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড, ১০০০ পিপিএম মানে এক কেজি টুথপেস্টে ১০০০ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড। একটা বড়ো ২০০ গ্রাম টুথপেস্টে ২০০ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড। ফ্লুরাইডের মিনিমাম লিথাল ডোজ হল ৫ মিলিগ্রাম/কেজি। তার মানে ২০

চিত্র: ১. হাড়ের ফ্লুরোসিস

একটা বড়ো টুথপেস্ট একজন বড়ো মানুষকে মেরে ফেলতে পারে, একটা ছোটো টুথপেস্ট পারে একজন শিশুকে মারতে।

কেজির একটি বাচ্চার শরীরে ১০০ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড প্রবেশ করলে সে মারা যেতে পারে, ৪০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক এক মানুষ মারা যেতে পারে শরীরে ২০০ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইড প্রবেশ করলে; অন্য কথায়, একটা বড়ো টুথপেস্ট একজন বড়ো মানুষকে মেরে ফেলতে পারে, একটা ছোটো টুথপেস্ট পারে একজন শিশুকে মারতে। যদি ভাগ্যক্রমে মারা নাও যায়, তীব্র বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেবে, যার জন্য তাকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা করা দরকার। আর ফ্লুরাইডের মিনিমাম লিথাল ডোজ ৫ মিলিগ্রাম/কেজি—এ কথাটার মানে কিন্তু এই নয় যে তার নীচে কোনো বিপদ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন*-এর মতো অতিমান্য ডাক্তারি জার্নাল লিখেছে, ০.৩ মিলিগ্রাম/কেজি ডোজে ফ্লুরাইড গা বমি ভাব, বমি, পেটব্যথা, পাতলা পায়খানা ও মাথাব্যথা সৃষ্টি করে থাকে। আরেকজন গবেষক দেখিয়েছেন, এমনকী ০.১ মিলিগ্রাম/কেজি ডোজেও ফ্লুরাইড নানারকম তীব্র (অ্যাকিউট) বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখাতে পারে। শেষোক্ত গবেষকের কথা যদি বাদও দিই, *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন*-এর মাত্রাটাই ধরি, তাহলেও বলতে হচ্ছে, ১০ কেজি ওজনের এক শিশুর পেটে যদি ৩ মিলিগ্রাম ফ্লুরাইডও যায়, অর্থাৎ মাত্র তিন গ্রাম টুথপেস্ট ছোটো বাচ্চাটি খেয়ে ফেলে, তার তীব্র বিষক্রিয়া হতে পারে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ৫০ কেজি ওজনের একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মাত্র ১৫ গ্রাম টুথপেস্ট খেয়েই বিপদে পড়তে পারেন। এ ছাড়াও ফ্লুরোসিস বা দীর্ঘমেয়াদি বিষণের এক কারণ হল টুথপেস্টে ফ্লুরাইড, এবং দন্তক্ষয় নিবারণে ফ্লুরাইডের ভূমিকা, খুব কম করে বললেও, অত্যন্ত 'বিতর্কিত'।

আমেরিকায় ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্টের মোড়ক ও টিউবের গায়ে ১৯৯৭ সাল থেকে এই সতর্কতা-বার্তা মুদ্রিত করতে হয়—''৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। দৈবাৎ দাঁত মাজার টুথপেস্ট খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক বা বিষনিয়ন্ত্রণ সংস্থার সাহায্য নিতে হবে।"

ভারতে ১৯৯০ সালে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টের সংশোধনীতে বলা ছিল, ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্টের মোড়ক ও টিউবের গায়ে লিখতে হবে, ''সাবধান: ৭ বছরের কম বয়সের শিশুকে ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্ট দেওয়া যাবে না।" কিন্তু সেটা ১৯৯১ সালের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বাদ চলে গেল। এখন খুব খুদে অক্ষরে লেখা থকে—''৬ বছরের কম বয়সি শিশুরা কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের তত্ত্বাবধানেই ফ্লুরাইডযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করতে পারে।" কেউ সেটা পড়েনও না, আর সতর্কবার্তা মেনেও চলেন না।

গ. বর্তমান বাজারে চালু আধুনিক চিকিৎসার ওষুধগুলোর এক বড়ো অংশ ফ্লুরিন-ঘটিত, আর কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলোর আরও বেশি অংশে ফ্লুরিন আছে। ওষুধগুলোর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক আছে যাদের নাম শেষ হয়—ফ্লক্সাসিন দিয়ে (যথা সিপ্রোফ্লক্সাসিন)। আবার অন্য ওষুধও আছে, যেমন মনোরোগের খুব চালু ওষুধ ফ্লুওক্সেটিন, বা ছত্রাক-সংক্রমণের ওষুধ ফ্লুকোনাজোল, বা ক্যানসারের ওষুধ ৫-ফ্লুরোইউরাসিল। পার্শ্বক্রিয়ার জন্য বেশ কিছু ফ্লুরিন-ঘটিত ওষুধ কোম্পানিগুলো বাজার থেকে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে মোটা ক্ষতিপূরণও দিয়েছে। যেমন ফেনফ্লুরামিন ও ডেক্সফ্লুরামিন ওজন হ্রাসের জনপ্রিয় ওষুধ ছিল। সেইসব ওষুধ ব্যবহারকারীদের এক বড়ো অংশের হৃদ্‌যন্ত্রের ভালবে রোগ হয়, ও ওয়েথ কোম্পানি ওষুধ তুলে নিতে বাধ্যতো হয়েছেই, তার সঙ্গে এক বড়ো মামলায় এতাবৎ বহু টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছে।

কতটা ফ্লুরাইড বা ফ্লোরিন নানারকম ওষুধের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে, ও তার ফলে কতটা স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে, সেটা নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

পামাইরা সভ্যতার পতনে ফ্লুরাইডের ভূমিকা

ইতিহাসের শিক্ষা এই যে ইতিহাস থেকে কেউ কোনোদিন শিক্ষা নেয় না। প্রাচীনকাল থেকেই পরিবেশের অবনতির ফলে সভ্যতার পতন হয়েছে, কিন্তু আমরা বোধকরি ভাবি, আমাদের ক্ষেত্রে সেরকম হবে না। অতি প্রাচীন সুমেরিয় সভ্যতার কারণ ছিল জমিতে অতিরিক্ত লবণ জমে যাওয়া। রোমান সভ্যতার পতনের অন্যতম কারণ পানপাত্রের সিসা দূষণ। আজ থেকে প্রায় দু-হাজার বছর আগে, বর্তমান সিরিয়ায় দামাস্কাসের কাছে অবস্থিত পামাইরা সভ্যতার পতনের মূল কারণ ফ্লুরাইড। রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন মরুদ্যান শহর পামাইরা ছিল এক কর্মমুখর বাণিজ্যকেন্দ্র। জাপানের প্রত্নবিজ্ঞানীরা অকাট্য প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেই শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার পতন ঘটে ফ্লুরাইড বিষণের জন্য। আজও পামাইরা-র কুয়োর জলে ফ্লুরাইডের পরিমাণ অত্যধিক (৩ পিপিএম)। কবরের মানুষের দাঁত, হাড়ে সঞ্চিত ফ্লুরাইডের

পরিমাণ বেশি, আর তাতে ফ্লুরাইড বিষণঘটিত বিকৃতি পাওয়া গেছে। ইউনেস্কো পামাইরা-কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করেছে।

চিকিৎসা

ফ্লুরাইড বিষণজনিত অসুখের কোনো চিকিৎসা নেই। প্রাথমিক অবস্থায় যদি পানীয় জল (বা ফ্লুরাইডের অন্য উৎস) বদলানো যায় তাহলে সমস্যা অনেকটা কমে। যদিও সমস্ত সমস্যার সম্ভাবনা কমে কিনা, বা কমলে কতটা কমে সে নিয়ে উপযুক্ত তথ্য নেই, তবে আশা করাই যায় যে তাড়াতাড়ি দূষণমুক্ত জল পেলে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ সমস্যার সম্ভাবনাই কমবে। সুতরাং একমাত্র উপায় হল জল ও অন্য উৎসকে ফ্লুরাইডমুক্ত করে তোলা।

জলকে ফ্লুরাইডমুক্ত করার অনেক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সমস্যা হল সেসব প্রয়োগ করা শক্ত, অন্তত এখনও সর্বজনীন প্রয়োগ নালগোন্ডার মতো বহুদিন ধরে ফ্লুরাইড কবলিত জায়গাতেও সম্ভব হয়নি। জলের ফ্লুরাইড-দূরীকরণ পদ্ধতি হিসেবে নালগোন্ডা পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত, কিন্তু তা হলে কী হবে, এখনও নালগোন্ডার বহু মানুষ ফ্লুরাইড দূষিত জল পান করছেন।

ফ্লুরাইড-দুরীকরণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ও সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত হল নালগোন্ডা পদ্ধতি। এতে জলে রাসায়নিক যোগ করে, ঘেঁটে পরিস্রাবণ করে পানযোগ্য জল পাওয়া যায়। এ ছাড়া অনেক পদ্ধতি আছে; সক্রিয় অ্যালুমিনা ফিল্টার, পোড়ামাটি, কাঠকয়লা অস্থিভস্ম ইত্যাদি ব্যবহার করে সস্তা পদ্ধতি, রিভার্স অসমোসিস (ব্যয়বহুল)—এসবই কাজে লাগতে পারে। কিন্তু মনে হয় এগুলো সবগুলোর নানা সমস্যা আছে, কেননা তাত্ত্বিকভাবে যাই বলা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এগুলো ব্যবহার করে সবাই নিরাপদ জল পাচ্ছেন না, আর ফিল্টার ইত্যাদি থেকে বর্জ্যপদার্থ বা স্লাজ দূর করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে; তা পরিবেশে জমা হয়ে পানীয় জলে ফ্লুরাইড আবার চলে আসার সম্ভাবনা দূর করা যাচ্ছে না।

সামাজিক সমাধান

এখনও পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা বাংলায় চালু আছে, তার মধ্যে নদীর জল পরিশ্রুত করে পানীয় জল দেওয়াটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই পদ্ধতিতে বর্তমান চাষের জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়, ফলে ভূ-জল উত্তোলন অব্যাহত থাকবে, জল ও খাদ্যে ফ্লুরাইড আসা বন্ধ করা যাবে না। এ ছাড়াও ভু-জল উত্তোলনে ফল হিসেবে জলে লবণ বাড়ার সমস্যা, ভূ-জলস্তর নেমে যাবার সমস্যা, ভূ-জলে আর্সেনিক বিষণের সমস্যা—এগুলো থেকেই যাবে। তাই মনে হয়, প্রাযুক্তিক (টেকনিক্যাল) সমাধান যথেষ্ট নয়, চাই রাজনৈতিক সামাজিক সমাধান।

আমাদের বাংলায় জলসম্পদের অভাব নেই। বাংলার কৃষিতে নানাধরনের ধান ও অন্যান্য ফসল ছিল, সেগুলো সবুজ বিপ্লবের সময়ে একেবারে তুলে দেওয়া হল। প্রথাগত জলসেচের ঐতিহ্য ছিল। জল-সংরক্ষণের ব্যবস্থায় বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে রাখা হত পুকুর দিঘিতে। কিন্তু 'সমাজ-নিরপেক্ষ' বড়ো প্রযুক্তি আমদানি করার প্রবণতায় পুরোনো জলসেচ ও জল-সংরক্ষণের ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বড়ো মাপের নদীবাঁধ দিয়ে বা ভূ-জল উত্তোলন করে ফসল বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া কৃষিকার্য হয়ে উঠেছে কীটনাশক-রাসায়নিক সার নির্ভর, কিছু 'উচ্চফলনশীল' শস্য নির্ভর, যে শস্য অতিরিক্ত জল না পেলে কোনো ফলনই দেয় না। প্রযুক্তি-নির্ভর ও ব্যয়সাপেক্ষ এই চাষের নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে চলে গেছে বড়ো বীজ কোম্পানি, সার-কীটনাশক কোম্পানিগুলোর হাতে। চাষের ব্যয় বেড়েছে, তাতে ধনীচাষির পক্ষে সুবিধা বেড়েছে, দরিদ্র চাষি তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আরও বেশি। হয়তো-বা জল-সংরক্ষণের প্রাচীন ঐতিহ্যময় প্রযুক্তিগুলো নিয়ে আরও চিন্তা করা দরকার, তাদের ওপর নির্ভর করে নতুন জল-ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। অবশ্যই প্রাচীন মানেই নির্ভুল নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য পুঁজির আবিষ্কৃত প্রযুক্তির নির্বিচারে প্রয়োগও নির্ভুল নয়, আর প্রযুক্তিকে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে বদলে নেওয়াটাই বৈজ্ঞানিক, সেটা বোঝা দরকার। জল-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে, চাষের প্রযুক্তি বদলে নিলে, তবেই বোধ করি আর্সেনিক, ফ্লুরাইড প্রভৃতি 'নতুন' বিষের হাত থেকে স্থায়ী সমাধানের রাস্তাটার সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমডি, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক।

Advt

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

ফ্লুরাইড দূষণ: এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র?

ফ্লোরিন তথা ফ্লুরাইড দাঁত ও হাড়ের ক্ষতি করে, আরও নানা স্বাস্থ্য-সমস্যা ডেকে আনে। আমাদের দেশে ফ্লুরাইড-আক্রান্ত বহু অঞ্চল। তবুও আমরা টুথপেস্টে ফ্লোরাইড দিচ্ছি, আমেরিকা ও নানা দেশ জলে ফ্লুরাইড মেশাচ্ছে। তাতে লাভের অঙ্ক জানা নেই, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে বিস্তর। তবে কি এর পেছনে গভীর-গোপন কোনো কারণ আছে? আলোচনা করছেন **অহনা মল্লিক**।

এটা বহুকাল ধরেই জানা আছে যে অধিক মাত্রায় ফ্লুরাইড দাঁতের আর হাড়ের ভীষণ ক্ষতি করে। দাঁত হয়ে ওঠে হলুদ-কালো-বাদামি ছোপধরা, আর ভেঙে যায়। হাড়ে জায়গায় জায়গায় মোটা হয়ে ফুলে যায়, খোঁচা খোঁচা হাড় তৈরি হয়, আর হাড়গুলোকে বেঁধে রাখে যেসব দড়ি-দড়া (টেন্ডন, লিগামেন্ট, কার্টিলেজ) সেগুলো আধাখ্যাঁচড়া হাড়ের মতো শক্ত হয়ে যায়। জোয়ান মানুষগুলো কোমরভাঙা বুড়োর মতো হাঁটে আর যন্ত্রণায় কাতরায়। তার ওপর আবার আছে হাড়ভাঙা, বিশেষ করে নিতম্বের হাড় ভেঙে দ' হয়ে বিছানার সঙ্গে লেপটে যাওয়া। এ ছাড়া আছে গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা, গর্ভপাত বেড়ে যাওয়া, পুরুষদের শুক্রাণুর ক্ষতি, বাচ্চাদের ডাউন'স সিনড্রোম হওয়া ও বুদ্ধি কমে যাওয়া, থাইরয়েডের সমস্যা আর অ্যালঝাইমারস রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

কিন্তু মুশকিল হল 'কম মাত্রায়' ফ্লুরাইড নিয়ে। সেটা নাকি ভালো, এতই ভালো যে যদি পানীয় জলে ফ্লুরাইড খুব কম থাকে তবে সরকার বাহাদুর সেটা নিজে খরচা করে মিশিয়ে দেয়। সব সরকার দেয় না। আমেরিকা ও কয়েকটি দেশের সরকার দেয়। কেন দেয়? দেখা যাক।

মানবদেহে ফ্লুরাইড কি সত্যি প্রয়োজনীয়

এ দেশে দূষণ, বিশেষ করে পানীয় জল থেকে রাসায়নিক দূষণের কথা বলতে গেলে সবার আগে আর্সেনিকের কথা আসে। কিন্তু আর্সেনিকের কোনো উকিল নেই, ফ্লোরিনের আছে। আর্সেনিক যে মানবদেহের কোনো উপকারে লাগে না এই সত্যটা সর্বজনবিদিত, পানীয়-খাদ্য-পরিবেশে আর্সেনিককে এক দূষক হিসেবেই দেখা হয়, বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ফ্লুরাইড নিয়ে দ্বিমত প্রবলভাবেই আছে। কিছু বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণায় জীবদেহে ফ্লুরাইডের উপস্থিতি লক্ষ করে সিদ্ধান্ত নেন যে সামান্য মাত্রায় ফ্লুরাইড জীবদেহে অত্যাবশ্যক। তাঁদের সমালোচক বিজ্ঞানীরা বলেন, তাহলে তো সিসা, পারদ, আর্সেনিককেও জীবদেহে অত্যাবশ্যক বলতে হয়, কেননা এগুলোও জীবদেহে অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। সমালোচকদের মতে, কোনো মৌলকে 'জীবদেহে অত্যাবশ্যক' বলতে হলে তা দেহে পাওয়া যায়, এটুকু হলেই হবে না দেখাতে হবে যে সেটি দেহের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে, এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়াটি ওই মৌল বাদ দিয়ে হয় অসম্ভব, নয়তো কম ভালোভাবে হতে পারে। যেমন অজৈব আর্সেনেট ও ফসফেটের আণবিক গঠন অনেকটা একরকম বলে গ্লাইকোলাইসিস নামক বিপাক প্রক্রিয়ায় ফসফেটের জায়গায় আর্সেনেট ঢুকে পড়লে এটিপি নামক অত্যাবশ্যক জৈব-রাসায়নিকটির উৎপাদন কমে যায়। এখন ''গ্লাইকোলাইসিস বিপাক প্রক্রিয়ায় আর্সেনিকঘটিত যৌগ (আর্সেনেট) দেখা গেছে, সুতরাং অল্প পরিমাণে আর্সেনিক দেহে প্রয়োজন'' এমনটা বলা যায় না, কেননা আর্সেনেট ফসফেটের চাইতে কম কাজের, তাই আর্সেনিক মানবদেহে থেকে ক্ষতিই করছে। ঠিক সেরকমই দেহের কোনো প্রক্রিয়ায় ফ্লোরিনঘটিত যৌগের খোঁজ পেলেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অল্প পরিমাণে ফ্লোরিন দেহে প্রয়োজন। দেখাতে হবে যে ফ্লোরিনের অনুপস্থিতিতে ওই প্রক্রিয়াটি যেভাবে সম্পন্ন হয় তা কম কার্যকর। সেটা কিন্তু কোথাও দেখানো হয়নি।

দেখা যাক, পানীয় জলে ফ্লুরাইড মেশানো তথা ফ্লুরিডেশন প্রকল্পটির আদি হোতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে জিনিসটা এগিয়েছে। আমেরিকার জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ১৯৫১ সালে ফ্লুরিডেশন করার প্রকল্প প্রথম শুরু করে, আর ১৯৬০ সালে সেটা বেশ ব্যাপ্তি পায়; মোট ৫ কোটি মানুষ ফ্লুরিডেশনের আওতায় আসেন। এখন কম্যুনিটি ওয়াটার সিস্টেম ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা মোটামুটি ৭৫ ভাগ মানুষ ফ্লুরিডেশনের আওতায় আছেন। কিন্তু যদিও আমেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল প্রথমে ফ্লুরাইডকে 'অত্যাবশ্যক পুষ্টিদ্রব্য' তালিকায় রেখেছিল, কিছুদিন আগে সেটা বদলে দিয়েছে, কেননা, 'মানুষের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য এটা অত্যাবশ্যক এমন প্রমাণ নেই।' তবে এই কাউন্সিল এখনও ফ্লুরাইডকে স্বাস্থ্যের জন্য 'উপকারী মৌল' বলে মনে করে। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবার মতো। অত্যাবশ্যক নয়, মানে মানুষের বিকাশ ও বৃদ্ধি ফ্লুরাইড ছাড়া ঠিকঠাকই হবে, এইটা স্বীকার করে নেওয়া হল। তারপর বলা হল, এটা 'উপকারী মৌল'। যেটা ছাড়াও বিকাশ ও বৃদ্ধি ঠিকঠাকই হবে, সেটা খেলে উপকার হবে? তা হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু কার উপকার?

ফ্লুরিডেশন-এর পর জলে ফ্লুরাইডের মাত্রা ০.৭ মিলিগ্রাম/লিটার থেকে ১.২ মিলিগ্রাম/লিটার থাকবে, এমনটাই ধার্য করেছিল আমেরিকা। এই সেদিন, ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে, আমেরিকা এই মাত্রা বদলে দিল, বলল, ফ্লুরিডেশন-এর পর জলে ফ্লুরাইডের মাত্রা ০.৭ মিলিগ্রাম/লিটারের বেশি হলে চলবে না। এবং জানা গেল, যে পরিমাণ ফ্লুরিডেশন এতদিন

যে পরিমাণ ফ্লুরিডেশন এতদিন হয়ে এসেছে তার ফলে ওই জল পান করা মানুষদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগের দাঁতের ফ্লুরোসিস হয়েছে

হয়ে এসেছে তার ফলে ওই জল পান করা মানুষদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগের দাঁতের ফ্লুরোসিস হয়েছে, তবে কিনা, সেটা নেহাত 'সামান্য'

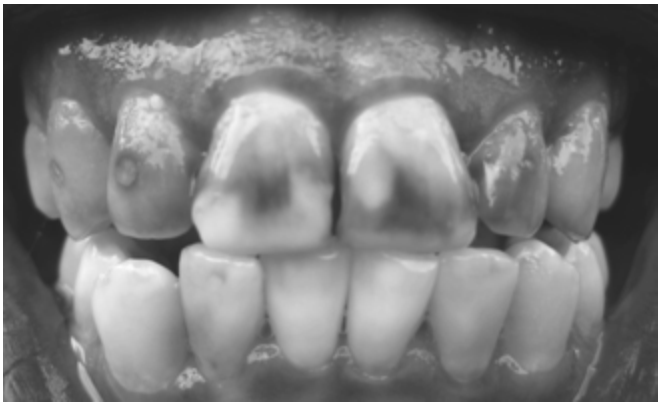

চিত্র: ১. দাঁতের ফ্লুরোসিস

(mild)। এর পাশাপাশি দুটো তথ্য রাখা যেতে পারে। তথ্য এক, আমেরিকার ফেডারেল সরকারের স্বাস্থ্য সংস্থা সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল (সিডিসি)-র নিজস্ব ওয়েবসাইট (http://www.cdc.gov/fluoridation/index.htm) জানাচ্ছে, ফ্লুরিডেশন করা জল পান করে শতকরা ২৫ ভাগ দন্তক্ষয় রোধ হয়েছে (Drinking flouridated water keeps the teeth strong and reduced tooth decay by approximately 25% in children and adults)। অর্থাৎ যাঁরা ফ্লুরিডেশনের কাজটি করছেন তাঁদের মতেই শতকরা ২৫ ভাগ দন্তক্ষয় রোধ করতে মূল্য দিতে হচ্ছে শতকরা ২০ ভাগের দাঁতের ফ্লুরোসিস। তথ্য দুই, ১৯৯৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্লুরাইড বিষয়ক এক্সপার্ট কমিটি আগের উচ্চ ফ্লোরাইডমাত্রার সুপারিশকে বদলে দিয়ে বলছে যে পানীয় জলে ফ্লুরাইডের মাত্রা কোনোমতেই ১ মিলিগ্রাম/লিটারের বেশি হলে চলবে না, আর ০.৫ মিলিগ্রাম/লিটার হলে সেটা নিম্নসীমা হিসেবে ঠিকই আছে বলতে হবে। তার মানে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমেরিকায় যে মাত্রা ধরা হয়েছিল (০.৭ মিলিগ্রাম/

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একুশ বছর ধরে বলে গেছে, ফ্লুরিডেশন করে আমেরিকার ফ্লুরাইড-মাত্রা বাড়াবাড়ি রকমের বেশি করা হচ্ছে।

লিটার থেকে ১.২ মিলিগ্রাম/লিটার), সেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে একেবারেই চলবে না। সেই 'একেবারেই চলবে না' মাত্রাটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণার পরেও আমেরিকা ২১ বছর ধরে চালিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' একটি স্বাধীন সংস্থা বটে, কিন্তু আমেরিকার বিজ্ঞান-প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা এটি অনেকটাই প্রভাবিত হয়। আমেরিকা কিছু বললে সেটা ভারত বা সার্বিয়ার বলা কথার চাইতে বেশি গুরুত্ব পায়; এটা বিশ্ব-রাজনীতিতে আমেরিকার অবস্থানের কারণে হতে বাধ্য। তবু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একুশ বছর ধরে বলে গেছে, ফ্লুরিডেশন করে আমেরিকার ফ্লুরাইড-মাত্রা বাড়াবাড়ি রকমের বেশি করা হচ্ছে।

ফ্লুরিডেশন এমনি হয় না, পয়সা খরচ করতে হয়। আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূলত 'ফেল কড়ি মাখো তেল' নীতিতে চলে। সেখানে ফ্লুরিডেশন নিয়ে, বা বলা ভালো এক্সপার্টদের মতের চাইতে বেশি পরিমাণে ফ্লুরাইড খাওয়ানো নিয়ে, ফেডারেল সংস্থা সিডিসি-র এত মাথাব্যথা কীসের? সিডিসি-র নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন অবশ্য কেবল ফ্লুরাইড নিয়ে নয়, অন্য প্রসঙ্গেও আছে, আছে তার অর্থ জোগান নিয়ে প্রশ্ন, যার খানিকটা অন্য এক খবরে আছে এই পত্রিকাতেই ''আমেরিকার সিডিসি কতটা নিরপেক্ষ?'' *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫, পৃ.১৯। প্রসঙ্গত, আমেরিকায় কিন্তু টিকাকরণ পর্যন্ত নিজের পয়সাতেই করতে হয়, তবে যাঁরা সেটা পারেন না, অর্থাৎ যাঁদের মেডিক্যাল ইনসুরেন্স নেই, বা গরিব বলে সরকারিভাবে স্বীকৃত, তাঁদের বিনিপয়সাতে টিকাকরণে ব্যবস্থা হয়েছে কয়েক বছর, মেডিকেইড প্ল্যানের অংশ 'ভ্যাক্সিন ফর চিলড্রেন প্রোগ্রাম'-এ। কিন্তু চান বা না চান, পানীয় জলে ফ্লুরিডেশন সেই ১৯৫১ সাল থেকেই বাধ্যতামূলক, এবং সে বাবদে পয়সা খরচ করতে সরকারি উৎসাহে খামতি নেই। দাঁত বাঁচাতে সরকারের এত মাথাব্যথা?

ফ্লুরিডেশনের নিরাপত্তা ও ঝুঁকির তুলনা

চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা কথা খুব চালু, 'থেরাপিউটিক উইনডো'। একটা ওষুধের কার্যকর ডোজ আর ক্ষতিকর ক্রিয়া হবার ডোজ-এ-দুয়ের মাঝখানটা হল থেরাপিউটিক উইনডো। বোঝাই যাচ্ছে যেকোনো ওষুধের থেরাপিউটিক উইনডো যত বিস্তৃত হবে সেই ওষুধ তত নিরাপদ। স্বাভাবিকভাবেই যদি এমন কোনো ওষুধ থাকে যেটা ছাড়া জীবন বাঁচবে না, সে ওষুধের থেরাপিউটিক উইনডো ছোটো হলেও তা মেনে নিতে হয়, সেই ওষুধ ব্যবহারে ক্ষতিকর ক্রিয়া বেশি হলেও সেটা ছাড়া আমাদের চলবে না। তাই হার্ট অ্যাটাক হয়ে প্রাণসংশয় হলে ডাক্তারবাবু যদি বলেন, প্রাণ বাঁচাতে এমন ওষুধ দিতে হবে যার ঝুঁকি বিস্তর, আমরা রাজি হয়ে যাই। হার্ট অ্যাটাকে মরফিন দেওয়া হয় যার থেরাপিউটিক উইনডো ছোটো, ডোজ একটু বেশি হয়ে গেলেই বিপদ। কিন্তু বুকে একটু চিনচিনে ব্যথায় মরফিন দিতে আমরা রাজি হই না, পায়ের ওপর একটা মামুলি দাগ তোলার জন্য বিপদ হতে পারে এমন ওষুধ নেবার কথা ভাবতেই পারি না। ওই একই কারণে, টিকা পেয়ে একটি শিশুর মৃত্যুও খুব আলোড়ন তোলে, কেননা শিশুটি তো সুস্থই ছিল, টিকা দেওয়া ঠিক 'থেরাপি' বা 'চিকিৎসা' নয়, রোগ আটকাতে নেওয়া ব্যবস্থা, আর ফ্লুরিডেশনও তাই। টিকা দিয়ে যে রোগ আটকানো হল, সেটা সেই শিশুর না হতেও পারত, তার টিকা নিয়ে মারা যাওয়া, এমনকী অসুস্থ হওয়াও আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। একই কারণে, ''শতকরা ২৫ ভাগ দন্তক্ষয় রোধ করে'' এমন ওষুধ (বা ব্যবস্থা, পানীয় জলে ফ্লুরিডেশন) দিয়ে যদি শতকরা ২০ ভাগের দাঁতের ফ্লুরোসিস হয়ে যায়, তা হলে সেটা মেনে নেওয়া অযৌক্তিক। এটা আরও বেশি অযৌক্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ এই কারণে যে এটা টিকা নেবার মতো স্বেচ্ছাধীন নয়, নাগরিকের ঝুঁকি আছে কিন্তু তাঁর বেছে নেবার স্বাধীনতা নেই, আর কে না জানে, আমেরিকা হল চূড়ান্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দেশ! এ ছাড়াও কোনো মানুষ জল বেশি খাবার 'অপরাধে' বাড়াবাড়ি রকমের ফ্লুরোসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশ বেশি, কেননা ফ্লুরাইড কৃত্রিমভাবে ঢুকিয়ে যে মাত্রা করা হচ্ছে (১.২ মিলিগ্রাম/লিটার), তার মাত্র দু-তিনগুণ মাত্রা ফ্লুরাইড প্রাকৃতিক জলে থাকার ফলে ভয়াবহ ফ্লুরোসিস হচ্ছে, এটা পরীক্ষিত সত্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, পানীয় জলে ১.৫

মিলিগ্রাম/লিটার ফ্লুরাইড থাকলে সামান্য ফ্লুরোসিস হবার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়াও রয়েছে ভুল করে বেশি ফ্লুরাইড দেবার ফলে দুর্ঘটনা। ১৯৯২ সালে আলাস্কায় এমন এক দুর্ঘটনায় ২৬১ জন মানুষ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, একজন মারা যান; ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যে আমেরিকায় এরকম তিনটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই ২০১০ সালেও নর্থ ক্যারোলিনায় ভুল করে সারা দিনে যতটা ফ্লুরাইড জলে মেশানোর কথা সেটা মাত্র দেড়ঘণ্টায় পাবলিক সাপ্লাইয়ের জলে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

কথা হল, এই ব্যাপারটা মানুষ তথা বিজ্ঞানীরা মেনে নিচ্ছেন কেন? বিজ্ঞানীদের কথা বলতে গেলে আমাদের আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার-এর কথা, মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স-এর কথা, বলতে হয়। তার অগে বরং দেখে নিই, 'মানুষ' কতটা মেনে নিচ্ছেন। ফ্লুরাইড নিয়ে প্রথম পর্যায়ের কাজ নাকি হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই, অন্তত আমেরিকার সরকারি সংস্থাগুলো তেমনই বলে। কথাটা সত্যি নয়, কেননা কোপেনহেগেনের ডা. কাজ রোহম (Kaj Rohlm, 1902-1948) সেই ১৯৩৭ সালেই জীবদেহে ফ্লুরাইডের প্রভাবের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বইটি লেখেন, *Fluoride Intoxication*। তবে সেই বইটি নিয়ে আমেরিকার সরকারি সংস্থাগুলোর তেমন উৎসাহ থাকার কথাও নয়, কারণ রোহম ফ্লুরাইডের সপক্ষে বলার মতো কিছুই খুঁজে পাননি, আর আমেরিকায় গবেষকরা, বিশেষ করে যে গবেষকরা সরকারি সংস্থায় কাজ করতেন, তাঁরা ফ্লুরাইড নিয়ে উচ্ছ্বসিত বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে রোহমের গবেষণাপত্র পড়েই ভারতে ডা. পণ্ডিত অন্ধ্রপ্রদেশের নালগোন্ডায় ফ্লুরাইডবিষণ অনুমান করেন, ও ১৯৩৭ সালে এ নিয়ে প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেকথা থাক। 'ফ্লুরাইড গবেষণায় অগ্রগণ্য' আমেরিকা ১৯৫১ সালে পানীয় জলে ফ্লুরিডেশন করার প্রকল্প প্রথম শুর করে, আর তারপর আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, হংকং, আয়ারল্যান্ড, ইজরায়েল, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইনস, সার্বিয়া, সিঙ্গাপুর, স্পেন, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ও ভিয়েতনাম পানীয় জলে ফ্লুরিডেশন করে। উঁহু, লিস্টিটায় একটু কম পড়ে গেল যে, ফিনল্যান্ড,

একটি 'বৈজ্ঞানিক' বিষয় সত্যিই কতটা বিজ্ঞানের নিঃস্বার্থ জ্ঞানান্বেষণ আর কতটা রাজনৈতিক খেলা।

জার্মানি, জাপান, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন—এরাও ফ্লুরিডেশন শুরু করেছিল—কিন্তু আবার বন্ধও করে দেয়। সর্বশেষে ইজরায়েলও ২০১৪ সালে ফ্লুরিডেশন বন্ধ করেছে।

তবু দাঁতের ক্ষয়রোধকারী বিবেচনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল (সিডিসি) জলে কিছুটা ফ্লুরাইড চাইছেন, ফ্লুরিডেশন ক্ষেত্রবিশেষে দরকার বলছেন। টুথপেস্টে ফ্লুরাইড দিয়ে আবার আইন করে দিচ্ছেন, টুথপেস্টের মোড়ক ও টিউবের গায়ে সতর্কতা-বার্তা লিখতে হবে যে, ''৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে, দৈবাৎ দাঁত মাজার টুথপেস্ট খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক বা বিষনিয়ন্ত্রণ সংস্থার সাহায্য নিতে হবে।" প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে ওই বিষাক্ত রাসায়নিকটা নিত্যব্যবহার্য হিসেবে দেওয়া হচ্ছে কেন? এটা কী করে হয়? এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের যেতে হবে প্রথাগত বিজ্ঞানচর্চার বাইরে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায়। ফ্লুরাইড-দূষণ নিয়ে আলোচনার রাজনৈতিক দিকটি আসবে অত্যন্ত মৌলিক স্তর থেকে। ভাববার চেষ্টা করতে হবে, একটি 'বৈজ্ঞানিক' বিষয় সত্যিই কতটা বিজ্ঞানের নিঃস্বার্থ জ্ঞানান্বেষণ আর কতটা রাজনৈতিক খেলা।

ফ্লুরাইড ও অ্যাটম বোমা

১৯৪২ সালে আমেরিকা শুরু করল পরমাণু বোমা বানানোর ম্যানহাটান প্রজেক্ট। নিউ মেক্সিকোর লস অ্যালামসে মূল কাজ হলেও, আরও ৩৫টি স্থানে এর নানা কাজ হত, আর সব কিছুই হত মিলিটারি গোপনীয়তার সঙ্গে, তার অনেক কিছুই আজও অপ্রকাশিত। প্রতি মাসে কম করে ৩৩ টন ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড, সংক্ষেপে 'হেক্স' তৈরি হত বোমার জন্য। হাজার হাজার টন হেক্স তৈরি করতে গিয়ে কয়েক হাজার টন হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ত। সেটা কর্মীদের ও আশেপাশের মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদের ক্ষতি করত। হয়তো কেউ কেউ সন্দেহ করতেন যে এই বিরাট এলাকায় খুব গোপন কীসব কাজের জন্য তাঁদের ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বেশি কিছু বলার বা জানার উপায় ছিল না। যুদ্ধের পরেও পরমাণু অস্ত্র তৈরির কাজ জারি থাকল, জারি থাকল ফ্লুরাইড-দূষণও।

অন্যদিকে, প্রেসিটেন্ড আইসেনহাওয়ার কথিত 'মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'-এর শক্তি ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। বড়ো শিল্প, সামরিক শক্তির নিয়ামকগণ, ও সরকার—এই তিনের লৌহ ত্রিভুজই হল 'মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'। ম্যানহাটান প্রোজেক্টের অনেক তথ্য এখনও গোপন। তবু কিছু কথা জানা গেছে। বিল ক্লিন্টনের আমলে ষোলো লক্ষ পাতার গোপন নথি প্রকাশ করা হয়, তবু ফ্লুরাইড নিয়ে সব নথি এখনও প্রকাশিত নয়। প্রকাশিত নথি থেকে জানা গেছে, বহু মানুষ, বিশেষ করে বন্দিদের ওপর অনেক নীতিহীন পরীক্ষা করা হয়েছিল তাঁদের সজ্ঞান-সম্মতি (informed consent) ছাড়াই। ক্লিন্টন সেইসব মানুষের জীবিত নিকট-আত্মীয়দের কাছে ক্ষমা চান, ও পরিবার-পিছু চার লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেন।

মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স

''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্টের কোনো সমরশিল্প ছিল না . . . বাধ্য হয়েই আমাদের এক বিরাট সমরশিল্প গড়ে তুলতে হয়েছে . . . এই ধরনের বিরাট সামরিক সংগঠন ও তার সহযোগী সমরশিল্প আমেরিকার ইতিহাসে নতুন। এই সংযোগের প্রভাব দেশের সমস্ত শহর, ফেডারেল গভর্নমেন্টের সমস্ত অফিসের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এমনকী আত্মিক প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করছে। . . . সরকারি দপ্তরে এই 'মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'-এর অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। . . . আমাদের শিল্প ও সামরিক বাহিনীর সংগঠন ও দৃষ্টিকোণে যে মূলগত পরিবর্তন ঘটছে, তার পেছনে আছে গত কিছু দশকের বিজ্ঞানপ্রযুক্তি বিপ্লব।

এই বিপ্লবের মূলে আছে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি গবেষণা যা এখন জটিল, ব্যয়বহুল . . . প্রাতিষ্ঠানিক। একক বিজ্ঞানীর . . . দিন গত। . . . এখন গবেষণাগার ও পরীক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত বিশাল কর্মীবাহিনী। . . . স্বাধীন ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও গবেষণা পরিচালনায় বিপ্লব ঘটে গেছে। . . . বিপুল ব্যয়বৃদ্ধি, যে জন্য সরকারি অনুদান অত্যাবশ্যক . . .।

জাতির বিদ্বানরা ফেডারেল সরকারের চাকরি ও প্রোজেক্ট পাওয়ার ওপর নির্ভরশীল, আর অর্থের প্রবল প্রভাব সর্বত্র . . . এটাকে খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারকে যথাবিহিত সম্মান করার সঙ্গে সঙ্গে, এও দেখতে হবে যে সরকারি নীতি যেন ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ চক্রের হাতেই বন্দি না হয়ে যায় . . .”

—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডুইট আইসেনহাওয়ার, বিদায়ী ভাষণ, ১৯৬১।

ইন্টারনেটে http://avalon.law.yale.edu/20th_century/eisenhower001.asp-এ প্রাপ্য।

নীতিহীন পরীক্ষাগুলোতে ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, ফ্লুরাইড ও অন্যান্য দ্রব্য মানুষের শরীরে কী প্রভাব ফেলে তা দেখা হয়েছিল। সমস্ত নথি প্রকাশ না পাওয়ার ফলে ফ্লুরাইডজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যাচ্ছে না। তবু যেটুকু জানা যাচ্ছে সেটাই শিল্পমহলে আতঙ্কের কারণ, কেননা ফ্লুরাইড দূষণ তো কেবল পরমাণুশক্তি, পরমাণু বোমার জন্য হয়নি। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু প্রস্তুতি, লৌহ-ইস্পাত শিল্পও তো ফ্লুরাইড দুষণ করেছে। আমেরিকায় ক্ষতিপূরণের মামলা একবার সাফল্য পেলে সেগুলো বড়ো বড়ো কোম্পানির চরম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, সরকারেরও মাথায় হাত পড়বে। সেটা হতে দেওয়া যায় না। তার উপায় কী? এক কথায়, আইসেনহাওয়ার যে ‘মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স’-এর অশুভ প্রভাবের কথা বলেছিলেন, সেই প্রভাববলয় বহুদিন যাবৎ ফ্লুরাইড নিয়ে বিজ্ঞানকেই (অপ) ব্যবহার করতে চাইছে। ফ্লুরাইড যে ভালো, দোষের জিনিস নয়, সেটা প্রমাণ করার সবথেকে ভালো উপায় হল বিজ্ঞানীদের দিয়ে গবেষণা করিয়ে প্রমাণ করা, এবং সেই গবেষণার ওপর দাঁড়িয়ে বলা, কম মাত্রায় ফ্লুরাইড মানবশরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক। তারপর টুথপেস্টে ফ্লুরাইড যোগ করা (যেহেতু ‘ফ্লুরাইড দন্তক্ষয় রোধ করে’) হল, এবং আমেরিকা ও তার কিছু মিত্ররাষ্ট্রে ‘জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে’ পানীয় জলে ফ্লুরাইড যোগ করা (ফ্লুরিডেশন) হল। এবার যদি প্রমাণও হয় ফ্লুরাইড ক্ষতিকর, ‘মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স’ সবসময়েই বলতে পারবে, যে সময়ে শিল্পজাত ফ্লুরাইড মানবদেহে ঢুকেছে সেইসময়ে ফ্লুরাইড খারাপ জিনিস বলে জানাই ছিল না; জানা থাকলে ফ্লুরাইড আটকানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হত।

এবার বোধহয় বোঝা যাচ্ছে, আর্সেনিক নিয়ে যত সহজে কাজ করা সম্ভব, ফ্লুরাইড নিয়ে তা সম্ভব নয়। এতে মার্কিন সরকারের সামরিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, এই নিয়ে সেই ১৯৪০-এর দশক থেকে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে নানা ধোঁয়াশা ছড়িয়ে। সত্য আস্তে আস্তে সামনে আসছে, কিন্তু স্বার্থের দ্বন্দ্বে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান

এমনভাবেই জড়িয়ে গেছে যে কোনোদিনই এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত (scientific consensus) গড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। তবু কীভাবে আমেরিকায় ফ্লুরাইড-বিষণ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বিরোধিতা করেছেন, আর কীভাবে সেই বিরোধিতার মোকাবিলা করা হয়েছে, এই নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে তার আদিপর্বের কথা একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে।

মার্টিন বনাম রেনল্ডস মেটাল মামলা

১৯৪৬ সালের শেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওঁরেগন-এর ট্রাউটডেলে একটা র‍্যাঞ্চে পল মার্টিন ও তাঁর স্ত্রী ভেরা মার্টিন থাকা ও চাষবাস শুরু করেন। কিছুদিন পরে তিনি দেখেন যে র‍্যাঞ্চের গোরু, ঘোড়া, শুয়োর, ভেড়া এগুলো রোগে ভুগে মারা যাচ্ছে, আর তাঁদের নিজেদের শরীরও খারাপ হয়ে পড়ছে। মার্টিন দম্পতি ও তাঁদের মেয়ে পাওলার হজমের গোলমাল, সারা গায়ে ব্যথা, মাঢ়ী থেকে রক্তপাত। ডাক্তার দেখালেন তিনি। কেন যে এমন হচ্ছে, কোনো ডাক্তারই আর বলতে পারেন না। অবশেষে সন্দেহ হল, পাশের নতুন রেনল্ডস মেটাল কোম্পানির চিমনির কালো ধোঁয়া থেকেই এরকম হচ্ছে।

মার্টিনরা আসার কিছুদিন আগে রেনল্ডস মেটাল কোম্পানি ওখানে একটা অ্যালুমিনা কারখানা গড়ে তোলে। নানা ডাক্তার ডেকে, পরিবেশবিদদের সঙ্গে কথা বলে মার্টিন পরিবার নিশ্চিত হলেন যে সেই কারখানার ধোঁয়ার ফ্লুরাইড তাঁদের স্বাস্থ্যহানির কারণ। শুরু হল মামলা। এই মামলার আগে কোনো শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ফ্লুরাইডে মানুষের ক্ষতির জন্য মামলা হয়নি। বড়ো শিল্পপতিগোষ্ঠিগুলো ভয় পেল, এই রায় কারখানার বিরুদ্ধে গেলে তা এক মামলার বন্যার সৃষ্টি করবে। ‘মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স’ এর অন্য অংশ সরকারপক্ষ ভাবল, একে তো শিল্পপতিদের ক্ষতি, তার ওপরে রয়েছে পরমাণু বোমা সংক্রান্ত পুরোনো ফ্লুরাইড সমস্যা, সেটা আবার বোতল থেকে বেরিয়ে পড়বে। ফলে মনাস্যান্টো ও অ্যালকোয়া সহ ছ-টি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী রেনল্ডস মেটাল-এর পক্ষে তথা মার্টিন পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। মার্টিনরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সেসময়ের ব্রিটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিসিন রিসার্চ ডাইরেক্টর ডা. হান্টারকে ব্রিটেন থেকে উড়িয়ে নিয়ে এলেন তাঁরা। মার্কিন কোর্টে সাক্ষী দিলেন হান্টার; তাঁর মতে, মার্টিনদের পরিবেশে রয়েছে অত্যধিক মাত্রায় ফ্লুরাইড, আর ফ্লুরাইডজনিত যেসব সমস্যা হবার কথা সেগুলোই তাঁদের হচ্ছে। ল্যাবরেটরি রিপোর্ট উল্লেখ করে ডা. হান্টার জানালেন, ফ্লুরাইডের বিষক্রিয়া অনেক এনজাইমের কাজকে

ব্যাহত করে। রেনল্ডস মেটাল কারখানা থেকেই যে ফ্লুরাইড নির্গত হয় তার প্রমাণ আগেই ছিল। নিম্ন আদালতের রায় মার্টিনদের পক্ষে গেলে উচ্চ আদালতে আপিল করল রেনল্ডস মেটাল। সেখানেও মার্টিনদের কথা মেনে নেওয়া হল। শিল্পপতিদের উকিল বললেন, ফ্লুরাইড নির্গমন বন্ধ করতে হলে অ্যালুমিনাম শিল্পই বন্ধ করতে হয়, আর তাহলে 'জাতীয় স্বার্থ' মার খাবে। এটা বোধকরি ভারতীয় পরিবেশবিদদের খুব পরিচিত এক কুযুক্তি। কিন্তু সান ফ্রানসিস্কোর আদালত নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল রাখল। অগত্যা আবার আপিল; কোর্ট বসল সমস্ত বিচারপতিদের নিয়ে। আমেরিকার বড়ো শিল্পপতিরা সবাই দাঁড়াল রেনল্ডস মেটাল-এর সমর্থনে। কিন্তু বিচারক জর্জ ডেনম্যান তাদের হতাশ করে রায় দিলেন, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্য সব শিল্পে যে ফ্লুরাইড ব্যবহৃত হয় তা মানুষের শরীরের পক্ষে চরম বিপজ্জনক।

এইবার 'মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'-কে অন্য কায়দা নিতে হল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে যে কী আলোচনা হয়েছিল তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু অচিরেই ফলাফল দেখা গেল। ফ্লুরাইডের দূষণ নিয়ে যেসব গবেষণা হচ্ছিল তার সবই বন্ধ করে দেওয়া হল (তথ্যাভিজ্ঞ পাঠকের মনে পড়তে পারে, কীভাবে ভোপালে গ্যাসকাণ্ডের পরে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ অনেকগুলো গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়, আর কীভাবেই বা সেগুলো হঠাৎ করে মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়)। ফ্লুরাইড-দুষণ যেসব প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল সেগুলো প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। কেমন করে হল? সে প্রশ্নের উত্তর প্রায় সমসাময়িক কালেই দিয়ে গেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডুইট আইসেনহাওয়ার, তাঁর ১৯৬১ সালের বিদায়ী ভাষণে। আর্সেনিক নিয়ে এই সমস্যা নেই, তাই বহু প্রাচীন থেকে অর্বাচীন ওষুধে আর্সেনিক ব্যবহৃত হবার ইতিহাস থাকলেও কেউ বলে না, কমমাত্রার আর্সেনিক ভালো, স্বাস্থ্যকর। শুধু কম মাত্রার ফ্লুরাইড আর স্বল্পমাত্রার পারমাণবিক বিকিরণ নিয়ে সত্যিকারের স্বাধীন গবেষণা করার পথ যেনতেনপ্রকারে বন্ধ করার চেষ্টা জারি আছে।

এতে সাময়িকভাবে ফ্লুরিনকে বাজারে চালিয়ে দেওয়া হল বটে, কিন্তু আমেরিকার মানুষদের থামিয়ে দেওয়া গেল না। এখন চলছে ফ্লুরিনপন্থী ও ফ্লুরিনবিরোধীদের মধ্যে যুদ্ধ। ফ্লুরিনপন্থীদের হাতে সরকার, ফান্ড, শিল্প,

শুধু ফ্লুরিনবিষণ নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্ত রাসায়নিক বিষণে আমেরিকা উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত

বিজ্ঞানীদের কেরিয়ার, গবেষণার সমস্ত সুযোগ, জার্নাল, প্রতিষ্ঠিত গবেষকের দল। ফ্লুরিনবিরোধীদের আছে কেবল সরকার আর বেসরকারি শিল্পসংস্থার হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁদেরই প্রচেষ্টায় আজ এটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত যে শুধু ফ্লুরিনবিষণ নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্ত রাসায়নিক বিষণে আমেরিকা উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, ইউরোপ উন্নয়নের পথে অনেকটাই ব্যালান্সড। শিল্পোন্নত সুপারপাওয়ার হবার মূল্য চুকিয়ে দিতে হচ্ছে আমেরিকার জনসাধারণকেই। আর তারই পার্শ্বক্রিয়ায় আমাদের দেশে ফ্লুরাইড দূষণ নিয়ে সরকার ও বিজ্ঞানীদের অনেকের গা-ছাড়া ভাব। সামগ্রিক আন্দোলন ছাড়া এই অবস্থা বদলাবে না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র:

১। অধ্যাপক মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, *পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪।

২। জোয়েল গ্রিফিথ ও ক্রিস ব্রাইসন-এর লেখা Fluoride, Teeth, and the Atomic Bomb. http://fluoridealert.org/articles/wastenot414/

৩। অ্যালবার্ট স্কাজ-এর Low-Level Fluridation and Low-Level Radiation. Two Case Histories of Misconduct in Science, http://www.fluoridation.com/schatz.htm.

লেখক একজন প্রাবন্ধিক

Advt

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

ভারতীয় লোকভেষজবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা

মানবেন্দ্র রায়

১.

প্রথাসিদ্ধ ও গবেষণাভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা শুরু হওয়ার বহু যুগ আগে থেকেই মানুষ উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পদার্থসমূহকে ব্যবহার করে এসেছে রোগ প্রতিরোধে ও নিরাময়ে। আবহমানকাল ধরেই মানুষ লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করত ভেষজবিদ্যাকে। প্রাচীন যুগের বনচারী মানুষেরা তাদের জীবন ধারণ ও রক্ষণের জন্য নানান উপকরণ সংগ্রহ করত উদ্ভিদ জগৎ থেকে। ভারতবর্ষে প্রাক্ আর্যযুগের মানুষেরা নিজের এবং গৃহপালিত পশুপাখির রোগ নিরাময়ের জন্য গাছ-গাছড়া, লতাপাতা ও শেকড়বাকড়ের রস, কাথ ও বড়ি ব্যবহার করত। বৈদিক যুগে ভেষজবিদ্যার বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। অথর্ববেদ ও উপনিষদ ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যার প্রমাণ গ্রন্থ হিসেবে আজও মান্যতা পায়। প্রাক্ আর্য যুগের মানবগোষ্ঠীর ভেষজ-জ্ঞান চর্চার লিখিত তথ্যাবলি না থাকায় বৃহৎ অংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা, কিছু কিছু অংশ ভারতে আগত জনজাতির জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। পুরাণ, মহাকাব্য, কোষ গ্রন্থ (অমর কোষ) এবং বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র) সেইকালের লোকভেষজ বিদ্যার অনেক মূল্যবান তথ্য লিখিত আছে।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিরনিচ্ এবং রিচার্ড-এর মতে লোকভেষজবিদ্যা প্রথাগত চিকিৎসাবিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, সিদ্দা, ইউনানি ইত্যাদি চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলিত শাখার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর, ভারতীয় ভেষজউদ্ভিদ গ্রন্থের লেখক কিরতিকর ও বসু বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, লোকভেষজবিদ্যার জ্ঞানকে সমস্ত ধরনের চিকিৎসা অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর জন্য প্রাচীন-মধ্য এমনকী আধুনিক যুগের লোকভেষজবিদ্যার তথ্যাবলি উদ্ধার ও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আবশ্যক আজও দেশের প্রত্যন্ত অংশে বসবাসকারী অবহেলিত জনগোষ্ঠীর লোকচিকিৎসার তথ্যাবলি উদ্ধার ও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সব তথ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়করণে অসংখ্য নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোয় ওই সব তথ্যকে যাচাই করে নেবার মতো উদার মানসিকতা।

বর্তমানে ভারতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় লোকভেষজবিদ্যার গবেষকগণ নিয়ত পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছেন, গবেষণাপত্র প্রকাশ করে চলেছেন দেশ-বিদেশের নামি পত্রপত্রিকায় আর মূল্যবান বইও লিখে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে *ট্রাইবাল হেলথ, ট্রাইবাল মেডিসিন এথেনো ফারমাকোলজি, ফোক মেডিসিন, পয়জনাস প্ল্যান্টস* এবং *দি ট্রাইবাল এরিয়াস অব্ ইন্ডিয়া* বইগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ব্যবহারিক তাৎপর্য পর্যালোচনা করে ড. জৈন লোকভেষজবিদ্যাকে ঔষধতত্ত্ব, স্ত্রী ও প্রসূতিবিদ্যা, নবজাতকের চিকিৎসাবিজ্ঞান, অস্থি ও চক্ষু বিষয়ক চিকিৎসাবিদ্যা, পশু চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেছেন। এই বিভিন্ন শাখা ধরে অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজকে আরও গভীর এবং ব্যাপক করার প্রয়াস একান্তভাবেই আবশ্যক। জনসংখ্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণে, গৃহপালিত পশু-পাখির চিকিৎসায়, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে ও নিরাময়ে আদিবাসী জনজাতিরা যে সাফল্য দেখিয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক বিজ্ঞানীদেরও অবাক করে দিয়েছে। তাই লোকভেষজবিদ্যা প্রসঙ্গে আদিবাসী জনজাতির ধারণা ও অভ্যাসসমূহকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ না করে বর্জন করা উচিত নয়।

২.

আদিবাসী ও উপজাতীয় চিকিৎসায় **বন্ধ্যাত্বকরণে ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে** ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ ও ভেষজ উপাদানসমূহ যেমন খাম আলুর ডায়সজেনিন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে খাসিয়া বেগুন, শ্বেতকুঁচ, আপাং ইত্যাদিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনে রাখতে হবে সমগ্র জনসংখ্যার নিরিখে ভারতীয় আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৭.৫ শতাংশ। ওদের জন্মহার ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও খুবই কম। এর কারণ খুঁজতে বিজ্ঞানীদের ওই জনগোষ্ঠীর লোকভেষজবিদ্যার দ্বারস্থ হতেই হবে।

হিমালয়ের পাহাড়ি অধিবাসীরা কনিফার গোত্রের বিশেষ কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদকে **ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে** সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে। এমনকী অতিসাধারণ এবং অতিপরিচিত গাছ নয়নতারারও ক্যান্সার নিরাময়ে প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এ কথাও জানাচ্ছে লোকভেষজবিদ্যাই।

কীট-পতঙ্গ দমন ও বিতাড়নের জন্য অত্যাধুনিক মানুষেরা উগ্র রাসায়নিক পদার্থসমূহ ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে। অথচ, তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত বা অ-শিক্ষিত এবং সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত আদিবাসী ও উপজাতির মানুষেরা পরিবেশ দূষণ না ঘটিয়ে প্রাকৃতিকভাবেই কীটপতঙ্গ, এঁটুলি, জোঁক ইত্যাদিকে দমন করতে পারে উদ্ভিজ্জ উপাদান প্রয়োগ করেই। এই কাজে তারা আতা, নোনা, বাসক, বচ্, নিশিন্দা, নিম, মহানিম, বনতামাক, রেড়ি, তুলসী, গন্ধবেনে, মুথাঘাস, কুরচি, মেথি, শিউলি, কলকে, অর্জুন, বহেরা, রিঠা ইত্যাদি উদ্ভিদকে ব্যবহার করে থাকে। যে মশা ও ছত্রাক দমন করতে আধুনিক বিজ্ঞান হিমশিম খাচ্ছে বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠী সেই কাজটাই সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করত উপরোক্ত বিশেষ কয়েকটা উদ্ভিদের উপক্ষার, ট্যানিন, গঁদ, তরুক্ষীর ইত্যাদি ব্যবহার করে।

আজকের অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও মানুষ আর্সেনিক যুক্ত জল খেতে বাধ্য হচ্ছে . . . পাচ্ছে না জীবাণুমুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল। তাই ভুগছে অসংখ্য জলবাহিত রোগে। জলকে জীবাণুমুক্ত ও পরিশ্রুত করার

জন্য ভারতীয় আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সুপ্রাচীন কাল থেকে নির্মলী বীজ দানা, খসখস গাছের মূল ব্যবহার করে আসছে।

অত্যন্ত আক্ষপের সঙ্গে বলতে হয়, আজও গৃহপালিত **পশু-পাখির চিকিৎসা-ব্যবস্থা** আমাদের দেশে নিতান্তই অপ্রতুল। চিকিৎসালয় যেমন নেই, তেমনি সাধারণ মানুষ পশু চিকিৎসায় উদ্যোগী এবং ওয়াকিবহাল নয়। অথচ, আদিবাসী ও উপজাতিরা তাদের গৃহপালিত পশুপাখির চিকিৎসার জন্য প্রায় সাত শতাধিক ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার করে আসছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই অধিকতর ভেষজ জ্ঞানের অধিকারিণী। পশুপাখির চিকিৎসায় তারা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ সাফল্য পেয়ে আসছে। পশু-পাখির চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রধান এবং পরিচিত উদ্ভিদগুলো হল—বনকুলত্থ, কেশুত, গিলাফল, লাল গাব, ধুধুল, ফার্ন, কুমারিকা, বাবলা ইত্যাদি। ওরা কোন রোগে, কোন উদ্ভিদের কোন অংশকে কীভাবে ব্যবহার করে তার বিবরণ ও তালিকা বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে তৈরি করলে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যেতেই পারে।

মনে রাখতে হবে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রধান উপজীবিকাই হল কৃষি ও পশুপালন। তাই এই দুই ক্ষেত্রে তারা উদ্ভিজ্জ উপাদানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ যত্নবান হয়েছে, তেমনি চূড়ান্ত উৎকর্ষতাও দেখিয়েছে। তারা ধানখেত কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দু-শোরও বেশি ধরনের গাছকে ব্যবহার করে, আধুনিককালের আবিষ্কৃত রাসায়নিক গরল ব্যবহার না করে। মশা বিতাড়নের জন্য তুলসী, ধুনা, নিশিন্দা, নিমপাতার সঙ্গে গন্ধবেনা ঘাস ও মুথা ঘাসের মুথার গুঁড়ো মিশিয়ে এক ধরনের পাউডার মিশ্রণ তৈরি করে তার ধোঁয়া ব্যবহার করে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার আদিবাসী সম্প্রদায় তাঁদের ধানগাছকে ছত্রাক ঘটিত রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য পড়াশী উদ্ভিদের শেকড়ের ক্বাথ ব্যবহার করে।

যৌবন-শ্রী ও সৌন্দর্যকে ধরে রাখা ও বৃদ্ধি করার প্রবণতা সমস্ত মানুষের মধ্যে বর্তমান—আদিবাসীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে, তারা এর জন্য দামি উগ্ররাসায়নিক কসমেটিকস ব্যবহার করে না। প্রাকৃতিক গাছগাছড়াকেই ওরা ব্যবহার করে আসছে অনাদিকাল থেকে। মাথার খুশকি নিবারণে, চুল ওঠা বন্ধে, টাক পড়া রোধে, চুলের অকালপক্কতা প্রতিরোধে আর ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখার প্রয়াসে আধুনিক যুগে গবেষণার যেমন অন্ত নেই তেমনি নিত্য নতুন কসমেটিকসের বিজ্ঞাপনেরও শেষ নেই—কিন্তু, কৃত্রিম উপাদানের সাহায্যে রূপচর্চার কুফলও আজ প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাই গবেষকগণ আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সৌন্দর্যচর্চার উপাদানসমূহের সন্ধানে নিয়োজিত। তাঁরা দেখেছেন আদিবাসীরা মেহেন্দি, ভৃঙ্গরাজ, কেশুত, গুঞ্জ, হেনা, কুজরি, কুর্চি ইত্যাদি প্রজাতির উদ্ভিদকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে আসছে। সেই সূত্র ধরে সারা ভারতে বর্তমানে শতাধিক কোম্পানি ত্বক, চুল, দাঁত-মাড়ী, চোখ, নখ ইত্যাদির সৌন্দর্য উৎকর্ষতার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি ব্যবহার করে হার্বাল প্রোডাক্টস্ তৈরি করছে।

রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় লোকভেষজবিদ্যার প্রয়োগের সমস্ত দিক উল্লেখ করতে গেলে 'মহাভারত' হয়ে যাবে, তাই সে কাজ থেকে বিরত হয়ে বিষয়ের ব্যাপ্তি, গভীরতা আর সম্ভাবনার একটা রূপরেখা তৈরি করা যাবে।

ভারতের আদিবাসী ও উপজাতিরা উত্তেজনা (টেনশান) উপশমের জন্য মুক্তাঝুরি, ছাতিম, রক্তশালুক, পলাশ, অপরাজিতা, শিমূল ইত্যাদি উদ্ভিদের উপাদান ব্যবহার করে। অনিদ্রা রোগ দূর করার জন্য সূর্যমুখী গোত্রের বিশেষ কিছু উদ্ভিদের পাতার নির্যাস ব্যবহার করে। বিভিন্ন মানসিক রোগে (পাগলামি, ফিট) ক্যানসকোরা ডিকাসেটা উদ্ভিদের পাতার ক্বাথ সেবন করায়। শ্বেতীরোগে ক্লিওম ব্র্যাকিকারপার গাছের পাতার কাই আর কুষ্ঠ রোগে কানাশিরা উদ্ভিদ ব্যবহার করে। বিভিন্ন ধরনের বাত রোগে আদিবাসীরা লবঙ্গ, রসুন, তিল, রেড়ি, আখরোটের গুঁড়ো, নয়নতারা ও আকন্দের পাতা ব্যবহার করে আসছে। চোখের ছানি আর চোখ ওঠা (কনজাংটিভাইটিস) রোগে তারা কাজে লাগায় শ্বেত অপরাজিতা, হাতিশুঁড়, রক্তবহড়া গাছকে। অস্থিরোগে আদা, রাস্না হাড়জোড়া গাছ আর রক্তাল্পতায় ডুমুর, কচুশাক ও কুলেখাড়া ব্যবহার করে আদিবাসীরা অনেক আধুনিক টনিক মলমকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। জ্বর, চর্মরোগ, বাত, বসন্ত, কুষ্ঠ, কৃমি, ব্লাডসুগারের মতো বহু রোগেই নিম মহৌষধ হিসেবে বিবেচিত। আর, শ্লেষ্মা, বাত, শয্যাক্ষত এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগে নিশিন্দার ব্যবহার হয় সাফল্যের সঙ্গে। বিশ্বের অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ভারতীয় লোকভেষজ উদ্ভিদের কদর ক্রমশ বর্ধমান। এদের ঔষধি গুণের কথা জেনেছিলেন ও জানিয়েছিলেন তথাকথিত গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক চিকিৎসকগণই।

৩.

মানুষের বংশপরম্পরায় লব্ধ অভিজ্ঞতা যা তারা লাভ করে জীবনের প্রতিকূল সমস্যাবলি ও সময়কে অতিক্রম করার তাগিদে, তারই পৌনঃপুনিক প্রয়োগ-ভাণ্ডার হল লোকজ্ঞান। এই জ্ঞান দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই তৈরি হয়। তবুও, লোকজ্ঞানকে বিজ্ঞানের আসনে বসাতে রাজি নয় তথাকথিত আধুনিক ও সভ্য মানুষেরা। কিন্তু বিজ্ঞানেরও মৌলিক ধর্ম হল, সে নিরন্তর ভুল শোধরাতে শোধরাতে চরম সত্য ও সূত্রের দিকে এগোয়। অন্যদিকে, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক তথ্য-সত্য-সূত্রের জন্ম হয়েছে লোকজ্ঞানের গর্ভ থেকেই। তাই, লোকজ্ঞানকে অবহেলা না করে চর্চা ও মূল্যায়ন করলে অমূল্য সম্পদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সারা বিশ্বেই

আধুনিক চিকিৎসার জন্ম হয়েছে লোকচিকিৎসার গর্ভ থেকেই—একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। শুধুমাত্র অনীহা আর অবহেলার জন্য অনেক কার্যকর লোকৌষধ হারিয়ে গেছে।

প্রাচীন লোকভেষজবিদ্যা ও লোকচিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক ও হাতুড়ে তকমা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে এসেছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা যা বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থার দৌলতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আবার, বর্তমানের অত্যাধুনিক ঔষধ প্রসঙ্গে প্রচলিত মত হল প্রায় প্রতিটি ওষুধেরই কোনো-না-কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে . . . তাকে গার্ড করার জন্য দেওয়া হয় আর একটা ওষুধ . . . আবার সেটিকে গার্ড করার জন্য অন্য আর একটি . . . এভাবেই চলতে থাকে। এর শেষ কোথায়? এও তো একরকম হাতড়ে বেড়ানোই।

স্বাধীন ভারতে আধুনিক চিকিৎসার প্রবর্তন করে (ইংরেজ রাজত্বের উত্তরাধিকার স্বরূপ) আমাদের দেশীয় লোকচিকিৎসাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যে চিকিৎসা প্রণালী গড়ে উঠেছিল আমাদের দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের দৈহিক ও মানসিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ঔপনিবেশিকবাদীরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই দেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে চালু করেছিল তাদের ব্যয়বহুল জটিল চিকিৎসা ব্যবস্থা। ভারতীয় লোকভেষজবিদ্যার চর্চা অব্যাহত থাকলে বর্তমানে অবশ্যই তা আরও সংশোধিত, উন্নত এবং আধুনিক হয়ে উঠত।

এখনও ভারতবর্ষের গ্রাম-গঞ্জ, পাহাড়-বনে লোকভেষজবিদ্যার চর্চা চলছে . . . রয়েছেন প্রবৃদ্ধ লোকচিকিৎসকগণ। তাঁদের ব্যবহৃত ভেষজ উপাদান, ঔষধ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ প্রণালী এবং প্রয়োগবিধি নিয়ে নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন। ভারতীয় লোকচিকিৎসার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার যেমন প্রয়োজন, তেমনি গবেষণার ভিত্তিতে লোকভেষজবিদ্যার একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্ররূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাও চালানো উচিত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্য উৎস:

১. *প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান*—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

২. *উনিশ শতকে বাঙালির লোকচিকিৎসা ও বিজ্ঞানমনস্কতা*—সোমা মুখোপাধ্যায়

৩. *ওষুধের উপনিবেশবাদ*—কমলেশ সেন

৪. *লোক উদ্ভিদবিদ্যা*—দুলালচন্দ্র পাল

৫. *মনন*—পঞ্চম বর্ষ ২৩ তম সংখ্যা—১৪১৮।

লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

সম্পাদকীয় মন্তব্য

শ্রী মানবেন্দ্র রায়-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ''ভারতীয় লোকভেষজবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা'' নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে কিছু কথা বলা দরকার মনে হয়েছে, তাই এই ক্ষুদ্র অবতারণা—সম্পাদক, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*।

ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজা হয়ে বসার পর এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির বহুল প্রসার শুরু হয়। সে সময়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থা বিজ্ঞান নির্ভর (scientific) বা প্রমিত (standardized) হয়ে ওঠেনি, তা ছিল বহুলাংশেই (অপ-) বিশ্বাসনির্ভর ও ব্যক্তি-চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। এদেশের সে সময় চালু চিকিৎসাপদ্ধতিগুলিও (যথা আয়ুর্বেদ) একই রকম বিশ্বাসনির্ভর ছিল। লোকচিকিৎসাপদ্ধতি, লোকভেষজবিদ্যা, বা সামগ্রিকভাবে লোকজ্ঞান ছিল বিশ্বাসনির্ভর, আঞ্চলিক, এবং মূলত প্রান্তবাসীর অবলম্বন। পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার জগতে লোকজ্ঞান যেন অনেকটাই কেবলমাত্র নৃতত্ত্বের বিষয় হিসেবেই এসেছিল, জ্ঞানের জগতে অন্যের অবদান বিনামূল্যে আত্মসাৎ করার পাশ্চাত্য প্রবণতাও তাই লোকজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনায় নতুন।

এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যে এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসার শুরুর সময়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির চাইতে এইসব দেশীয় পদ্ধতিগুলি কোনো অংশে কম ফলদায়ক ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা ও তার ফলস্বরূপ মানসিক-সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের সুবিধা সেদিন পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি পেয়েছিল, এবং মূলত তারই জোরে এই ব্যবস্থা এদেশীয় এলিট সম্প্রদায়ের অনুসৃত পদ্ধতি হয়ে ওঠে; জনসাধারণও আস্তে আস্তে এই 'রাজা'-র চিকিৎসার সুযোগ অল্পস্বল্প পেতে থাকে। কালক্রমে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি, যা এদেশে 'অ্যালোপ্যাথি' নামে বেশি পরিচিত, তা-ই প্রধান মান্য চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়।

এর পাশাপাশি, পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি রেনেসাঁর যুক্তিবাদী ধারার উত্তরাধিকার অনেকাংশে লাভ করার ফলে, বুনিয়াদি বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেকে বদলাতে থাকে ও বিশ্বাসনির্ভরতা থেকে বিজ্ঞান-নির্ভরতায় ধীর উত্তরণ ঘটতে থাকে। অ্যানাটমি জ্ঞানের উন্নতির ফলে শরীরে নানা অঙ্গের ক্ষতির সঙ্গে রোগলক্ষণ মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় (যথা পেটে ব্যথার সঙ্গে পাকস্থলির ঘা-র সম্পর্ক)। ফিজিওলজির জ্ঞানের বিকাশের ফলে শরীরের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কাজের সম্পর্ক (যথা নাড়ির গতির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সম্পর্ক, ও জ্বরের সময় নাড়ির গতি বৃদ্ধির কারণ) হাতেকলমে জানা যায়। রসায়নবিদ্যা ও তারপর জীবরসায়নবিদ্যার জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে আণবিক পর্যায়ে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ অনেকটা বোঝা গেল। প্যাথোলজি ও ওষুধবিদ্যা (ফার্মাকোলজি) এর ফলে মূলগতভাবে বুনিয়াদি-বিজ্ঞানের অংশ হয়ে উঠল। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য-ইতর নানা সভ্যতার অভিজ্ঞতা-অর্জিত চিরাচরিত জ্ঞানভাণ্ডারগুলি পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি যাচাই করে ও দরকার মতো বদল করে আত্মসাৎ করে ফেলল, জ্ঞানভাণ্ডারের আদি জনকেরা পাশ্চাত্য টেক্সটবইয়ের ফুটনোটও হয়ে উঠতে পারলেন না।

যে সময়পর্বে চিকিৎসাপদ্ধতি এইভাবে নিজের উত্তরণ ঘটিয়ে 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত' চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পাবার কাজটা করছিল, সেই সময় এদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি নিজস্ব শাস্ত্রকোটর থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ মূলত নেয়নি; বুনিয়াদি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে নিজের জ্ঞানভান্ডারকে মিলিয়ে দেখার, প্রয়োজনে নিজেকে বদলে নেবার কাজটি না-করাই রয়ে গেছে। পুরোনো কিছু ধারণার (যথা আয়ুর্বেদ-এর বায়ু পিত্ত ইত্যাদি ত্রিদোষ তত্ত্ব) কোনো সমর্থন বুনিয়াদি বিজ্ঞানে না পাওয়া গেলেও 'প্রাচীন জ্ঞানের অভ্রান্ত নিদর্শন' হিসেবে সেগুলো মেনে নেওয়া হল, আর এইভাবে এদেশীয় পদ্ধতিগুলি নিজেদের পশ্চাদমুখী করে তুলল। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-চেতনায় দেশীয় বিজ্ঞানের ধারণার এক স্রোত যেমন ছিল বৈজ্ঞানিক (যথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়), অন্য স্রোতটি তেমন ছিল ঐতিহ্যসর্বস্ব (যথা 'ব্যাদে সব আছে')। এই দু-ধারার মিলন ঘটানোর

প্রচেষ্টা যে একেবারে হয়নি তা নয়, কিন্তু তা অতি ক্ষীণ, দুর্বল ও অলক্ষণীয় থেকে গেছে। আর লোকভেষজবিদ্যার বা সামগ্রিকভাবে লোকজ্ঞানের চালিকাশক্তি ছিলেন সাধারণ 'অশিক্ষিত' মানুষ, তাঁরা পাশ্চাত্যের তৈরি করা জ্ঞানকাঠামোর বাইরের থেকে গেলেন। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটল না, লোকবিদ্যার বিকাশ ঘটাতেও তাঁরা পারলেন না।

আজকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা একদিকে যুক্তিসঙ্গত (rational) ও সাক্ষ্যনির্ভর (evidence-based) হয়ে উঠেছে, ফলে কোনো রোগে কী ওষুধ/চিকিৎসা কতটা কাজ করতে পারে বা পারে না, চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা কোথায় ও কেন, সে সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা চিকিৎসকের কাছে আরও বেশি সম্ভব হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, ওষুধশিল্প (drug industry) ও চিকিৎসা-পরিষেবাশিল্প (health care industry) ক্রমশ আয়তনে ও ক্ষমতায় বেড়েছে, ব্যক্তি-চিকিৎসক, চিকিৎসক-সংগঠন, চিকিৎসা-গবেষণা, এমনকী সরকারি ও আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর ওপরে এদের প্রভাব বাড়ছে। যেকোনো ইন্ডাস্ট্রির মতোই ওষুধশিল্প ও চিকিৎসা-পরিষেবা ইন্ডাস্ট্রি মুনাফাকেন্দ্রিক, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষমতা যতই বাড়ছে ততই সে 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত' চিকিৎসাপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দিকটি মুখ থেকে মুখোশে পর্যবসিত করার চেষ্টা করছে, এবং বাণিজ্যিক অবৈজ্ঞানিক অমানবিক দিকটি ক্রমশ বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে চলছে নিজের কেনা অবদান নানা অমানবিক পেটেন্ট-আইন ইত্যাদির মাধ্যমে রক্ষা করার পাশাপাশি অন্যের অবদান বিনামূল্যে আত্মসাৎ করার চেষ্টা। নিম, তুলসী ইত্যাদি নিয়ে পেটেন্ট করার প্রচেষ্টা হয়েছে, অথচ আয়ুর্বেদ ও লোকভেষজবিদ্যায় এগুলোর অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না, বরং এ-দু-য়ের অর্জিত জ্ঞানকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যে জনগোষ্ঠী আয়ুর্বেদ ও লোকভেষজবিদ্যার অভিজ্ঞতায় প্রাথমিক জ্ঞান গড়ে তুলেছিল, তারা 'বিজ্ঞানসম্মত' চিকিৎসার ওষুধশিল্পের কাছে কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। এই দ্বিচারিতা খতিয়ে না দেখলে মনে হতে পারে যে লোকভেষজবিদ্যার গবেষণা কেবল কল্যাণকামী, তার আত্মসাৎকামী রূপটি অধরা রয়ে যাবে।

মানুষের ও পশুপাখির চিকিৎসায় ও কৃষিকাজে লোকভেজ বিদ্যার যথার্থ প্রয়োগ আজ পর্যন্ত করা হয়নি। তাই লোকবিদ্যার গবেষণা অবশ্যই দরকার, কিন্তু তার জন্য গবেষণালব্ধ ফলের মালিকানার প্রশ্নটিও সামনে না আনলে বিজ্ঞানের নামে লোকজ্ঞান আত্মসাৎ করার জন্য ব্যস্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কর্পোরেটগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না। দু-টি কাজ করার দাবি একসঙ্গে একই মঞ্চ থেকে না তুললে জনসাধারণের বদলে হয়তো-বা ওষুধশিল্প ও চিকিৎসা-পরিষেবা ইন্ডাস্ট্রির কর্পোরেটগুলোরই হাত শক্ত করা হবে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

শব্দ-ছক-২

		১ স			২ এ	গ			৩ ই	কো
	৪ চি	কে	ন	৫ প	ক্স		৬ ভা	টি	গো	
৭ রি	কে	ট		টা		৮ বা	ই			
	ন			৯ সি	১০ টি		১১ রা	গী		
১২ মা	গু	র	১৩ ডা	য়া	বি	১৪ টি	স		১৫ এ	ন
	নি		১৬ হা	ম		টে			ই	
১৭ ব্যা	য়া	ম				না		১৮ রে	চ	ন
			১৯ সা	ই	২০ না	স			আ	
২১ ট		২২ স	য়া		সা		২৩ স		২৪ র	ক্ত
২৫ ক	২৬ পা	র	টি			২৭ ও	বে	২৮ সি	টি	
	ন		২৯ কা	র্বা	ষ্ক	ল		টি		

মানবিকতার আয়নায় মৃত্যুদণ্ড

রুমঝুম ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষ গৌরবে, অগৌরবে তার স্বাধীনতার ৬৮ বছর পূর্ণ করেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু আজও মৃত্যুদণ্ড সংবিধান স্বীকৃত শাস্তি; যেখানে বিশ্বের বহু দেশেই মৃত্যুদণ্ড নামক শাস্তি রদ করা হয়েছে। আমাদের সবারই থাকে এক নিজস্ব আয়না। আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয় কী কী খুঁত রয়ে গেছে চেহারায়। আজ স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরে তাই দেখতে সাধ জাগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত মানুষের জন্য কতটা, কতটা মানুষের দ্বারা চালিত ও কতটা মানুষের হতে পেরেছে। কবি আহ্বান করে বলেছেন—মানুষ বড়ো কাঁদছে/তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও/মানুষই ফাঁদ পাতছে/তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও . . .

বর্তমান প্রবন্ধে মানবিকতার আয়নায় তাই যাচাই করে নেওয়া যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি হিসাবে কতটা মানানসই। ভারতবর্ষ সত্যিই পারছে কি নিরপেক্ষভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে?

মৃত্যুদণ্ড—তার উৎপত্তি

মৃত্যুদণ্ডের উৎপত্তি আসলে প্রতিহিংসা পরায়ণতার (vengeance) বোধ থেকে। মানুষের 'প্রাণী' হিসাবে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হল 'হিংসার বদলে হিংসা', 'রক্তের বদলে রক্ত'। এই প্রবৃত্তি থেকেই শাস্তিমূলক মৃত্যুদণ্ডের উৎপত্তি। সমস্ত আদিম ও বন্য মানবজাতির ইতিহাস 'মৃত্যুদণ্ড' নামক কলঙ্কে কীর্ণ, হ্যাঁ, আজকের মানবসভ্যতা জান্তব এই প্রতিশোধ স্পৃহাকে কলঙ্ক বলেই অভিহিত করবে। কারণ হাজার হাজার বছর আগে যখন সুস্থ বিচারব্যবস্থা বা আইনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি তখন অসভ্য মানুষ একে অন্যকে আঘাত করলে বা হত্যা করলে আহত বা নিহতের নিকট আত্মীয়রা হত্যাকারীর শাস্তিস্বরূপ তার পুরো পরিবারটিকেই হত্যা করতে উদ্যত হত বা অনেকাংশে হত্যা করত। উপরিউক্ত পরিস্থিতি বোঝাতে সামার যথার্থই বলেছেন 'injuries became crimes and revenge became punishment অর্থাৎ অপরাধ ও শাস্তি যেন হয়ে দাঁড়াল একই মুদ্রার দু-টি পিঠ।

সমাজ থেকে উদ্ভূত অথচ সমাজবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল সমাজ ও ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র। রাষ্ট্র ব্যক্তিগত প্রতিশোধের সংকীর্ণতা থেকে আপাত-মুক্ত এক ব্যবস্থায় নিজের হাতে তুলে নিল এই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব অর্পণ ব্যক্তি কেন মেনে নিল? ব্যক্তি একদিকে অনুভব করল ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ও রক্তক্ষরণ ভবিষ্যতের সুরক্ষা দিতে অক্ষম, অন্যদিকে রাষ্ট্রের শক্তিশালী সংগঠনের সামনে ব্যক্তি যেমন নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে অপারগ, তেমনই, ব্যক্তি মোটামুটি বুঝে নিল যে রাষ্ট্র তার হয়ে যখন এই প্রতিহিংসার দায়িত্ব হাতে তুলে নেবে তখন ভবিষ্যতে তা দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকবে। রাষ্ট্র তার ক্ষমতার নখদন্তের বদলে মানবিক ও সমদর্শী এক রূপ জনগণের সামনে হাজির করতে চাইল—তৈরি হল বিচার ব্যবস্থা ও আইন। আহত বা নিহত ব্যক্তির পরিজন আদালতের দ্বারস্থ হল। তার প্রতিহিংসার অধিকারকেই যেন স্বীকৃতি দিল রাষ্ট্র। তফাত খালি এই দাঁড়াল এখন আর একই ব্যক্তিকে একাধারে বিচারক, জুরি ও ঘাতকের (ফাঁসুড়ের) ভূমিকা পালন করতে হয় না। রাষ্ট্র এই তিনটির ভূমিকা পালন করে ব্যক্তির প্রতিশোধপরায়ণতার পূর্তিতে সাহায্য করে। ব্যক্তির প্রতিশোধপরায়ণতার আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুদণ্ডের উৎস হলেও এর বিবর্তনের ধারাটি পর্যালোচনা করা যাক। যখন রাষ্ট্র ব্যক্তির হয়ে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করল তখন তার দু-টি প্রেষণা (motivation) কাজ করল। ১. অপরাধীকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে সে ওই অপরাধ আবার করার সুযোগ পাবে না ফলে সামাজিক সুরক্ষা বাড়বে আর ২. অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তি 'দৃষ্টান্তমূলক' হয়ে থাকবে ফলে সমাজের অন্য ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডের বীভৎসতায় ভীত, সন্ত্রস্ত হবে ও সমাজে অপরাধের সংখ্যা কমবে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের উপযোগিতা সংক্রান্ত এই যুক্তিগুলি কি সত্যিই যুক্তিসঙ্গত?

প্রথমত রাষ্ট্র ধরেই নিল যে একবার অপরাধ করেছে সে বার বার অপরাধ করবে। আর সেই ধরে নেওয়ার ওপর ভিত্তি করে লোকটির প্রাণ কেড়ে নিতে হবে যাতে সে আর অন্য কিছু ভাবার বা অন্যভাবে আচরণ করার কোনো সুযোগই না পায়। দ্বিতীয়ত পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখা গেছে সেই আদ্যিকাল থেকেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড ব্যবহার করা হলেও পৃথিবীর কোনো দেশেই কোনো অপরাধই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আদিমযুগে চীন দেশে মৃত্যুদণ্ডের যে সব ভয়ংকর প্রথা চালু ছিল (যেমন—গরমজলের কড়াইতে ফুটিয়ে মারা বা করাত দিয়ে দু-ভাগ করে শরীর চিরে দেওয়া) তাতে করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয়ে কবেই চীন থেকে অপরাধ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সত্যিই কি পরিসংখ্যানের ইতিহাস সে কথা বলে? মোদ্দা কথা হল, অপরাধ ও অপরাধীর সংজ্ঞা নিরূপণ করার আগে ভেবে দেখার সময় এসেছে অপরাধ কেন হয়? একজন ব্যক্তিকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করার আগে ও তাকে শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে বুঝে নিতে হবে অপরাধীর জন্ম দেওয়ার পিছনে রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা—তা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় যাই হোক না কেন।

অপরাধ কেন? অপরাধী কে?

দেশকাল নির্বিশেষে অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে অপরাধ অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর স্বার্থে উপনীত হয়। সমাজের ঘুণ ধরা আবহাওয়া, অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে জঘন্য অপরাধ করার জন্য। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাবও অস্বীকার করার উপায় নেই। ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে বিভিন্ন দেশ জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগে। মাস কিলিং যখন রাষ্ট্রের তরফ থেকে হয় তখন সে

অপরাধের বিচার হয় কোন আদালতে? কিছু গোষ্ঠী বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাস করে হত্যার মতো অপরাধ করেছে ও করে চলেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। জেহাদের নামে দিনের পর দিন ব্যক্তিকে প্রভাবিত ও প্ররোচিত করেছে অপরাধ করার জন্য। এক ইয়াকুব মেমনকে বা কাসভকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কি সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই প্ররোচনা দেওয়া থেকে বিরত করা যাবে? সত্যিই কি মৃত্যুদণ্ড এ ব্যাপারে সামাজিক সুরক্ষা বাড়াতে পারল? পারল না তো বটেই উলটে এই মৃত্যু আমাদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক মনে হলেও অন্য পরিপ্রেক্ষিতে তাই আদর্শপালনের পরাকাষ্ঠাস্বরূপে প্রকাশ পেল। এক সময়ে ব্রিটিশরা আমাদের দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তাঁরাও হত্যার অপরাধে অপরাধী। অথচ তাতে কি মৃত্যুদণ্ড দৃষ্টান্তমূলক ও অপরাধ প্রতিরোধকারী হিসাবে কাজ করেছিল, নাকি দেশভক্তির জোয়ারে ভেসে আরও কচিকাঁচা ছেলে নতুন উদ্যমে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আসলে অপরাধ কী সেই সংজ্ঞায়ন তো সম্পূর্ণ আপেক্ষিকতা দোষে দুষ্ট। অপরাধের সংজ্ঞা কাল ও স্থান (time & space) এই দুই মানদণ্ডকে (Reference) ছাপিয়ে উঠতে পারেনি কোনোদিনও, কারণ এই সংজ্ঞা যে মানুষের নিজের সুবিধার্থে স্বরূপ বদলেছে বার বার। সূর্য সেন, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বোস, আজমল কাসভ—ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা . . .। লাইনটা শেষ করার আগেই, সঠিক আবেগেই, রে রে করে তেড়ে আসবে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে ভারত সরকারের কাছে আজমল কাসভ যা ইংরেজ সরকারের কাছে প্রথম তিনজনও তাই ছিল। সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু আপামর ভারতবাসী মনে করে ওদের মৃত্যুদণ্ড ভুল তাই ওরা শহিদ। হয়তো কোথাও আজমল কাসভের জন্যেও শহিদ বেদি সাজানো হয় গোপনে। তার মানে রাষ্ট্রক্ষমতা বদল একটা মৃত্যুদণ্ডকে নস্যাৎ করে আর একটাকে মান্যতা দেয়।

অপরাধ কেন সে প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া গেল যথাসম্ভব। রাষ্ট্র, সে যে প্রকারই হোক না কেন----গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক—অপরাধী জন্মাবার পেছনে তার ভূমিকা অস্বীকার করতে পারে না। তাই আইন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড নামক শাস্তি দিতে যাবার আগে বিচার ব্যবস্থাকে অপরাধী নয় অপরাধকে খতিয়ে দেখতে হবে। তার জন্ম দিয়েছে যে প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের লড়াই হওয়া উচিত সন্ত্রাসবাদীর (ব্যক্তি) বিরুদ্ধে নয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।

আচ্ছা, সন্ত্রাসবাদ না হয় একটা গোলমেলে ব্যাপার। কিন্তু যেখানে অন্য 'হত্যা' অপরাধ সংগঠিত হয়েছে সেখানে তো রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ঠিক করে। কিন্তু ভালো করে দেখলে সেখানেও অনেক গোলমাল নজরে আসবে। আইনে হত্যা সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। Murder-এর দুটো ডিগ্রি আছে। একটা হচ্ছে পূর্বপরিকল্পিত, একটা পূর্ব পরিকল্পিত নয়। একটা কথা আছে Manslaughter—অর্থাৎ দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে অনিচ্ছাকৃত খুন কিন্তু কখনোই Murder নয়। আছে self defense—অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে খুন। আর এই সব আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অনেক প্রকৃত অপরাধীই বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে যারা অর্থবান এবং অন্যভাবে প্রভাবশালী। আর এটা সারা বিশ্বে স্বীকৃত সত্য। আমেরিকাতে একই অপরাধে 'কালো'দের শাস্তি 'সাদাদের থেকে বেশি হয়—বিশেষ করে সেই অপরাধ যদি সাদাদের ওপর হয়। তাহলে দেখা গেল 'হত্যার' মতো অপরাধ আদৌ অপরাধ কিনা সেটা নির্ধারণ করাও বেশ জটিল। আবার 'হত্যা' করে প্রভাবশালী ব্যক্তির আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাও প্রবল। কিন্তু যদি এমন একটা আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা ভাবা যায় যেখানে অপরাধকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সেটাও কি সমর্থনযোগ্য? একটু বোঝা যাক বিষয়টা—

একটা সময় চীনে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিত ফুটন্ত কড়াইতে সেদ্ধ করে মারা। শিউরে ওঠার মতো। এখন মৃত্যুদণ্ডের অতি বড়ো সমর্থকও বোধহয়

একটা সময় চীনে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিত ফুটন্ত কড়াইতে সেদ্ধ করে মারা। শিউরে ওঠার মতো।

এই ধরনের দণ্ডের কথা বলবেন না। কারণ সমাজ এখন শুধু 'প্রাণী' মানুষের থেকে বড়ো করে দেখে 'মানবতা'কে। আর সেখানে তাকালে সেদ্ধ করে মারাকে সমর্থন করা যায় না। আর এই দৃষ্টিকে আর একটু প্রসারিত করলেই সুশীল সমাজে 'মৃত্যুদণ্ডের' মতো কুৎসিত শাস্তিকে অনুমোদন করা যায় না। অপরাধের গুরুত্ব এবং অপরাধীর মানসিকতা মূল্যায়ন করে যদি দেখা যায়, সে সমাজে মেশার অনুপযুক্ত তাকে সারাজীবন অন্তরিন করে রাখা হোক। কিন্তু জীবনের অধিকার কাড়া যায় না। শাস্তির বিবর্তনের সঙ্গে জেলেরও বিবর্তন হয়েছে। কারাগার হয়েছে সংশোধনাগার। তাই তো অপরাধকে মূলস্রোতে মেশার উপযুক্ত করে তুলতে তাকে গানবাজনা, ছবি আঁকা, নাটকের তালিম দেওয়া হচ্ছে মনের কোমল প্রবৃত্তিগুলো জাগিয়ে তুলতে। কাউকে পড়াশুনা বা খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ফলও ফলছে। অনেক অপরাধী চমক লাগানো সাফল্য পাচ্ছেন। অর্থাৎ অপরাধীর মন পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু হয়তো ১৪ বছর কারাগারে থাকা এরকম এক পরিবর্তিত মানুষকেও বর্তমানে মূল্যায়ন না করে ১৪ বছর আগে করা অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এটা এক বিরাট দ্বন্দ্ব।

তা ছাড়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে রাষ্ট্র অনুমোদিত হত্যা। অনেকটা চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নেওয়ার মতো। এই প্রতিহিংসা-পরায়ণতা কখনো কোনো মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে না। মানবিকতা একটা অনুশীলনের বিষয়। তাই সমাজে মৃত্যুদণ্ড না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।

মানবিকতার মুখ না মুখোশ

মানবসভ্যতার অভ্যুত্থান ক্রমান্বয়ে মানুষকে জান্তব প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক হতে শেখাল। তাই যেমন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠল সামাজিক পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক ভিত, বিচার ব্যবস্থা, তেমনি মানুষের 'মানুষ হওয়ার অধিকার'-কে সুরক্ষিত করতে গড়ে উঠল মানবাধিকার কমিশন। কী কাজ তার? তার কাজ হল যখন যখন রাষ্ট্রের মানবতাধর্মী মুখোশটি খুলে পড়বে তখন মানুষের হয়ে লড়াইয়ে নামবে সে। যদিও আইনব্যবস্থা ও শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তি হল মানুষের অধিকার রক্ষা তবু মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তি হল রাষ্ট্রের সেই মানবতাধর্মী মুখোশ খুলে পড়া রূপটির প্রকাশমাত্র। ইউ এস ক্যাথলিক কনফারেন্সে যথার্থই বলা

হয়েছে—'we cannot teach that killing is wrong by killing' জীবনের বদলে জীবনকে প্রতিহিংসাই (জান্তব প্রকাশ) বলা চলে তাকে মানবিকতা বা সুবিচার বলা চলে না কখনো। যে রাষ্ট্র এ ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী সে যতই বিশ্বের দরবারে অহিংসার কথা বলে, নিজেকে মানবিকতার দূত বলে, নাম কুড়োবার চেষ্টা করুক তার মানবিকতা মুখোশমাত্র—মুখ হতে পারে না কখনো।

মৃত্যুদণ্ড—বিশ্বের অবস্থান

পরিবর্তন—এই হল বিশ্বের চরম সত্য। এই বিশ্বংসংসারে সবকিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন রূপে বিবর্তিত হচ্ছে। তাই মানুষ বুঝতে শিখেছে জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নয়। এই পৃথিবী তার ভালোমন্দ, ন্যায়অন্যায় সবকিছু নিয়ে মানবচেতনায় পরিস্ফুট হয়ে আছে। চেতনা লুপ্তি মানেই পৃথিবীর এই ঐহিক রূপরসেরও অবলুপ্তি। তাই জীবনমুখী মানবতাবাদে বাঁচার অধিকারকেই মানুষের অধিকারের তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হল। তাই-না বিচারব্যবস্থায় শাস্তিদান প্রথারও পরিবর্তন হল। তা হল জীবনমুখী। জেলের কয়েদিকে পশুর মতো বন্ধ করে না রেখে, মানুষের অধিকারে বঞ্চিত না রেখে নতুন সুযোগ করে দেওয়া হল—মানুষের মতো বাঁচার। বিশ্বের অবস্থান তাই মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে না গিয়ে গেল বিপক্ষে। ইউনাইটেড নেশন বিশ্ব জুড়ে মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী হল। ১৯৪৮, ১৯৫৯, ১৯৬৩, ১৯৬৮, ১৯৭১ . . . সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন অধিবেশন সংগঠিত হল এ বিষয়ে। স্টকহোম কনফারেন্সে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International) ঘোষণা করল— ১. তারা শর্তহীনভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী। ২. রাষ্ট্র ঘোষিত যেকোনো প্রকার মৃত্যুদণ্ডের প্রতি তারা ঘৃণা পোষণ করবে এবং ৩. তারা বিশ্ব থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট হবে।

সম্প্রতি ভারতে ঘটে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইন্ডিয়া। তাদের মতানুযায়ী The Indian government essentially killed a man in cold blood to show that killing is wrong.'' তাদের পক্ষ থেকে আরও বলা হল যে, –''It is a misguided attempt to prevent terrorism . . . Indian authorities often find it convenient to hold up capital punishment as a symbol of their resolution to tackle crime.''

প্রশ্ন তোলা হল তবে কি ভারত সরকার নিজের দোষ ঢাকতেই এই চমকদার ফাঁসির আয়োজন করল? তার নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিরাট ফাঁক কীভাবে পূর্ণ হবে একটা ফাঁসি দিয়ে? তার নাগরিকদের সুরক্ষার দায় কি ভারতের নয়?

দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সবদিক বিচার করে কবি চণ্ডীদাস ধার করে এই কথা বলা যায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' মানুষের হিতার্থেই রাষ্ট্র, তার বিচার ব্যবস্থা ও শাস্তিব্যবস্থা, কাজেই সেই মানবতাবাদেরই জয় হোক। প্রতিহিংসার মনোভাব কাটিয়ে উঠে সুস্থ বিচারই হোক আগামীর শপথ। মৃত্যুদণ্ড সমস্যার সমাধান নয় একথা বোঝার সময় এসেছে।

এখন মৃত্যুদণ্ডের মুহূর্তটিও ইউ টিউবে ভাইরাল হয়ে যায়। বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকাগুলি মানুষের অনুসন্ধিৎসার সুযোগ নিয়ে ব্যাবসায় মেতে ওঠে। তার ফলে 'মৃত্যুদণ্ড' কোথাও গিয়ে অপরাধের ফল না হয়ে 'গ্লোরিফায়েড মৃত্যু' হয়ে দাঁড়ায়।

এখন মৃত্যুদণ্ডের মুহূর্তটিও ইউ টিউবে ভাইরাল হয়ে যায়। বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকাগুলি মানুষের অনুসন্ধিৎসার সুযোগ নিয়ে ব্যাবসায় মেতে ওঠে। তার ফলে 'মৃত্যুদণ্ড' কোথাও গিয়ে অপরাধের ফল না হয়ে 'গ্লোরিফায়েড মৃত্যু' হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়ে শাস্তি হোক পরিবর্তনমুখী, বদলানোর চেষ্টা করা হোক অপরাধীর মনকে।

আর একথা অনস্বীকার্য যে গণতন্ত্র হল ''by the people, for the people and of the people'' তাই শুধু রাষ্ট্রকে দোষারোপ করাটাও বোধহয় নিরপেক্ষতার পরিচয় নয়। রাষ্ট্রে-র ভোটসর্বস্ব নির্ধারণ নীতির বিপরীতে ব্যক্তির মানবিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর দায়িত্ব সামাজিক মানুষকেই নিতে হবে। সুস্থ জনমত গড়ে উঠলে আমরা হয়তো মানবিকতার আয়নায় ভারতবর্ষের সুশীল রূপটি খুঁজে পাব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

রুমঝুম ভট্টাচার্য, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও প্রাবন্ধিক

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

ডায়াবেটিস সম্পর্কে জানার কথা

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

বছর কুড়ি আগে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুরুর বছরগুলোতে ডায়াবেটিস রোগী পেলেই পাঠাতাম মেডিক্যাল কলেজে এক সহপাঠীর কাছে, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, তখন মেডিসিন বিভাগের আরএমও। তখন ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করতেন এন্ডোক্রিনোলজিস্টরা, না হলে নিদেনপক্ষে মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। আমাদের ছাত্রাবস্থায় ধারণা ছিল ডায়াবেটিস সচ্ছল মানুষদের রোগ—যাঁরা শারীরিক শ্রম করেন না, ভালোমন্দ খান তাঁদেরই ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি। ধারণা বদলেছে—২০১১ খ্রিস্টাব্দে দেশের ৬ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিসের শিকার, ২০৩০-এর এই সংখ্যা বেড়ে ১০ কোটি ১০ লক্ষ হবে বলে অনুমান করা হয়। ডায়াবেটিস আজ কেবল বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার বিষয় নয়, আমার মতো জেনারেল ফিজিশিয়ানকেও আজ ডায়াবেটিসের চিকিৎসা জানতে হয়। আর রোগীদেরও রোগটা নিয়ে বিশদে জানতে হয়, নানান জটিলতা এড়াতে।

ডায়াবেটিস মানে বহুমূত্র। আজ যে রোগ নিয়ে বলছি তার নাম ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ—অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন তৈরি হওয়া কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে, অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন বেরোনো কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে অথবা ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা কমে গেলে যে রোগ হয়।

ইনসুলিন রক্ত থেকে গ্লুকোজকে শরীরের কোষে ঢুকতে সাহায্য করে, সেখানে গ্লুকোজ জ্বালিয়ে শক্তি তৈরি হয়। এ ছাড়া লিভারের কোষে বিভিন্ন ভাঙাগড়ার কাজেও সাহায্য করে ইনসুলিন। খাবার খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়তে থাকে, তখন অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন বেশি বেরোয় গ্লুকোজকে কাজে লাগাতে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে ইনসুলিন বেরোনো কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, যাতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব কমে না যায়।

ডায়াবেটিস মেলিটাস-এ রক্তে গ্লুকোজ থাকা সত্ত্বেও শরীরের কোষগুলো তাকে কাজে লাগাতে পারে না, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিসের উপসর্গ

প্রধান উপসর্গ তিনটে—

- বারবার প্রস্রাব হওয়া
- তেষ্টা বেড়ে যাওয়া
- খিদে বেড়ে যাওয়া

এ ছাড়া

- ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অথচ সেই গ্লুকোজকে জ্বালিয়ে শক্তি তৈরি করা যাচ্ছে না—তাই রোগী ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করেন।
- বয়স্ক রোগীদের অকারণ দুর্বলতা, শরীরের নানা জায়গায় জ্বালা বা ব্যথা, ঝিনঝিন করা, ঘা শুকোতে দেরি হওয়া, ইত্যাদির কারণ খুঁজতে অনেক সময় ডায়াবেটিস ধরা পড়ে।
- অনেকের আবার হার্টের অসুখ, উচ্চ-রক্তচাপ, বেশি মোটা হওয়া, বারবার জীবাণুসংক্রমণ----এসব হবার পর চিকিৎসকের কথামতো পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে ডায়াবেটিস রোগ পাওয়া যায়।
- মহিলাদের গর্ভাবস্থায় রুটিনমাফিক পরীক্ষাগুলো করতে গিয়েও অনেক সময় ডায়াবেটিস ধরা পড়ে।

ডায়াবেটিসের প্রকারভেদ

১. টাইপ ১ ডায়াবেটিস

এ ধরনের ডায়াবেটিস সাধারণত কমবয়সিদের হয়। এই অবস্থায় ইনসুলিন তৈরি খুব কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরনে ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

২. টাইপ ২ ডায়াবেটিস

এ ধরনের রোগ সাধারণত বেশি বয়সিদের মধ্যে দেখা যায়। এঁদের ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা অল্প কমে বা একদমই কমে না। কিন্তু ইনসুলিন ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না। এই ধরনের রোগে অনেক সময় হিসেব মতো খাবার খেয়ে ও ব্যায়াম করে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কম রাখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে বড়ি খেতে হয়। অনেকের আবার ৫-১০ বছর বড়ি খাওয়ার পর বড়িতে আর কাজ হয় না, তখন ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হয়। ডায়াবেটিসের এই ধরনটায় বংশগতির প্রভাব আছে, কিন্তু বংশগত উপাদানগুলোর সঙ্গে বেশি মোটা হওয়া, শারীরিক পরিশ্রম না করা, খুব বেশি মিষ্টি খাওয়া, মানসিক ও শারীরিক চাপের মতো কারণগুলো মিলে এই রোগ সৃষ্টি করে। এই ধরনের ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

৩. অপুষ্টিজনিত ডায়াবেটিস

আমাদের মতো গরিব দেশের মানুষদের প্রোটিন অর্থাৎ আমিষ ও প্রাণশক্তির অভাবে এবং খাবারে শ্বেতসার জাতীয় খাবার বেশি থাকায় ইনসুলিন

উৎপাদনকারী অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলো ক্রমশ খারাপ হতে হতে শেষ অবধি নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের চিকিৎসায় তাই ইনসুলিন দিতে হয়।

৪. অন্য অসুখের কারণে ডায়াবেটিস

ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমায়, কিন্তু অনেক হরমোন গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায়। যেসব অসুখে সেই হরমোনগুলো বেশি বেরোয় সে সবে অন্য অসুখের সঙ্গে ডায়াবেটিসও দেখা দেয়। যেসব মহিলার ডায়াবেটিস হওয়ার জন্মগত প্রবণতা থাকে তাঁদের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হতে পারে। যেসব মানুষের ডায়াবেটিস হওয়ার জন্মগত প্রবণতা থাকে তাঁদের স্টেরয়েড, উচ্চরক্তচাপের মূত্রবর্ধক ওষুধে ডায়াবেটিস হতে পারে। কোনো অসুখে অগ্ন্যাশয় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলেও ডায়াবেটিস হতে পারে। কোনো অপারেশনে অগ্ন্যাশয়ের অনেকটা বাদ দিয়ে দিলেও ডায়াবেটিস হতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগ-নির্ণয় করা হয় রক্তে গ্লুকোজ মেপে

➢ খালি পেটে রক্তরস-পরীক্ষায় গ্লুকোজ যদি অন্তত দু-বার ডায়াবেটিসের সীমায় (অর্থাৎ স্বাভাবিক সীমার ঊর্ধ্বে) থাকে তা হলে রোগ-নির্ণয় হয়ে যায়। তখন আর গ্লুকোজ খাইয়ে পরীক্ষা করার দরকার নেই।

খালি পেটে রক্তরসে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেই কিন্তু বলা যায় না, তাঁর ডায়াবেটিস নেই। তখন রোগীকে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা খালি পেটে রেখে ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ জলে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। এরপর ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করতে হয়। এই সময়ে ধূমপান করাও যায় না। ঠিক ২ ঘণ্টা পর শিরা থেকে রক্ত নেওয়া হয়। পরীক্ষার আগের তিনদিন রোগীকে দিনে অন্তত ৩০০ গ্রাম চালের ভাত বা ৩০০ গ্রাম আটার রুটি খেতে হয়। কোনো নিয়ম না মেনে স্বাভাবিক খাবার খেলে এই পরিমাণ শ্বেতসার খাওয়া হয়ে যায়।

রক্তরসে গ্লুকোজের মাত্রা (মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে)

	খালি পেটে	গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর
স্বাভাবিক	১১৫-র কম	১৪০-এর কম
বিকৃত গ্লুকোজ টলারেন্স	১১৫ থেকে ১৪০	১৪০ থেকে ২০০
ডায়াবেটিস	১৪০-র বেশি	২০০-র বেশি

‘বিকৃত গ্লুকোজ টলারেন্স’

এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের অনেকের তেমন পরিচিতি নেই, সুতরাং সেটা এখানে বুঝে নেওয়া দরকার। যাঁদের বিকৃত গ্লুকোজ টলারেন্স তাঁদের বছরে একবার করে রক্তে গ্লুকোজ পরীক্ষা করা উচিত, ওজন বেশি থাকলে কমানো উচিত, নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। পরে এঁদের মধ্যে

- কিছুজনের ডায়াবেটিস দেখা যায়।
- কিছুজনের বিকৃত গ্লুকোজ টলারেন্সই থেকে যায়।
- বাকিদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

গর্ভবতী মহিলাদের কিন্তু বিকৃত গ্লুকোজ টলারেন্স পাওয়া গেলেই ডায়াবেটিস আছে ধরে নিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

ডায়াবেটিস হলে কীই-বা ক্ষতি?

রক্তে গ্লুকোজ বেড়েছে—তাতে ভয়ের কী আছে? আসলে ডায়াবেটিস থেকে শরীরের প্রায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই রোগ হতে পারে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে শরীরের ছোটো ছোটো রক্তনালীগুলোতে ছোটো ছোটো ফোলা হয়, তারপর এই ফোলাগুলো ফেটে রক্তক্ষরণ হয়। এইভাবে—

- চোখের ভেতরের পর্দা রেটিনায় হয় ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সিদের মধ্যে অন্ধত্বের প্রধান কারণ।
- কিডনি আক্রান্ত হয়ে হয় ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, কিডনি বিকল হলে ডায়ালিসিস করা বা কিডনি বদল করা ছাড়া উপায় থাকে না।
- শরীরের নার্ভগুলোকে যে রক্তনালীগুলো খাদ্য ও অক্সিজেন জোগায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হয় ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা: ওষুধ ছাড়া

ক. খাবারদাবার নিয়ন্ত্রণ রোগীর উচ্চতা কতটা, ওজন উচ্চতার তুলনায় কম, ঠিক না বেশি, তিনি কী ধরনের কাজ করেন—এসবের ওপর ভিত্তি করে ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য-তালিকা ঠিক করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারে পরে কখনো আলোচনা করা যাবে।

খ. ব্যায়াম ডায়াবেটিস রোগী ব্যায়াম করলে রক্তে গ্লুকোজের নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়, রক্তে চর্বির মাত্রা অনুকূল থাকে, হার্ট ও রক্ত-চলাচলের কাজে উন্নতি হয়। হাঁটা হল সবচেয়ে সুবিধাজনক ও গ্রহণযোগ্য ব্যায়াম।

গ. রোগ সম্পর্কে জানা রোগটা কী এ থেকে কী কী জটিলতা হতে পারে, লাগাতার ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকা কেন গুরুত্বপূর্ণ—ইত্যাদি ডায়াবেটিস রোগীর জানা দরকার। বোঝা দরকার ডায়াবেটিসের ওষুধ খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ বা ব্যায়ামের বিকল্প নয়। মানে, ওষুধ খেলেও ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য খাবারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেই হবে, আর ব্যায়াম করতেই হবে; নইলে পুরো সুফল মিলবে না। এ ছাড়া রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে কীভাবে বুঝতে হবে আর সামলাতে হবে—তাও জানা দরকার। যেসব ওষুধ চলছে সেগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, অ্যালার্জি হলে কীভাবে বুঝতে হবে—তাও জানা দরকার। পায়ের যত্নও রোগীর জানা দরকার—নখ খুব ছোটো করে কাটা যাবে না, কড়া কাটা যাবে না, শক্ত ও টাইট জুতো পরা যাবে না, ইত্যাদি।

ওষুধ দিয়ে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা

ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়:

- সমস্ত টাইপ ১ ডায়াবেটিস রোগীদের—এঁদের দরকার হয় ইনসুলিন।
- এমন সব টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের যাঁদের ওজন কমে গেছে আর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব বেশি।
- এমন টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম করেও যাঁদের রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

ডায়াবেটিসের ওষুধ: ইনসুলিন

অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ থেকে বেরোনো হরমোন-ইনসুলিন। আগে গোরু ও শুয়োরের ইনসুলিন ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ব্যবহার করা হত। এখন বিশেষ ধরনের ই. কোলাই জীবাণুর জিন পালটে মানুষের ইনসুলিনের মতো ইনসুলিন কারখানায় তৈরি করা হয়। এর দাম বেশি, কিন্তু গোরু বা শুয়োরের শরীর থেকে তৈরি ইনসুলিন এখন আর পাওয়া যায় না। ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজকে কোষে ঢুকতে সাহায্য করে, কোষে ইনসুলিন গ্লুকোজ থেকে শক্তি তৈরিতে সাহায্য করে।

সব ডায়াবেটিস রোগীরই সব সময় সঙ্গে গ্লুকোজ বা চিনি রাখা দরকার।

ইনসুলিন একটা প্রোটিন, মুখে খেলে তা পাকস্থলীতে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ইনসুলিন চামড়ার নীচে বা শিরায় ইঞ্জেকশন দিতে হয়।

নানা রকম ইনসুলিন পাওয়া যায়, সেসব নিয়ে আলোচনা পরে করা যাবে।

রক্তে গ্লুকোজ কমানোর মুখে খাওয়ার ওষুধ

কয়েক ধরনের ওষুধ ডায়াবেটিসে ব্যবহার করা হয়—

- সালফোনিল ইউরিয়া গোত্রের ওষুধ-গ্লিবেনক্ল্যামাইড, গ্লিপিজাইড, গ্লাইক্লাজাইড, গ্লিমিপেরাইড, ইত্যাদি।
- বাইগুয়ানাইডস ওষুধ-মেটফরমিন।
- গ্লিটাজোন-পায়োগ্লিটাজোন। মূত্রথলির ক্যানসারের সঙ্গে এই ওষুধ ব্যবহারের সম্পর্ক পাওয়ায় কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক পায়োগ্লিটাজোনকে নিষিদ্ধ করেন।
- সালফোনিল ইউরিয়ার মতো ওষুধ-ন্যাটেগ্লিনাইড, রিপাগ্লিনাইড। এদের দাম কিন্তু সালফোনিল ইউরিয়ার থেকে আট থেকে দশ গুণ বেশি।
- আলফা গ্লুকোসাইডেজ ইনহিবিটর-অ্যাকারবোজ ও মিগলিটোল।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ

ডায়াবেটিসের জটিলতা: হাইপোগ্লাইসিমিয়া

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে খুব কমে যাওয়াকে বলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া।

ডায়াবেটিস রোগীদের হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়

- খুব কম খেলে বা দেরি করে খেলে।
- তিনি স্বাভাবিক যা পরিশ্রম করেন তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করলে।
- প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় ইনসুলিন নিলে বা ডায়াবেটিসের মুখে খাওয়ার ওষুধ খেলে।

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে প্রতি ডেসিলিটারে ৪০ মিলিগ্রাম বা তার কম হলে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার উপসর্গ দেখা যায়।

প্রথমে মাথা ঝিমঝিম করে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, খুব খিদে পায়, গা-বমি ভাব হয়, কথা জড়িয়ে আসে। এই অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম মতো গ্লুকোজ বা একমুঠো চিনি বা ৩-৪ টুকরো মিছরি বা যেকোনো মিষ্টি খেয়ে নিতে হয়। সব ডায়াবেটিস রোগীরই সব সময় সঙ্গে গ্লুকোজ বা চিনি রাখা দরকার।

খুব তাড়াতাড়ি রক্তের গ্লুকোজ কমতে থাকলে বা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব কমে গেলে রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন কেননা তাঁর মস্তিষ্কে গ্লুকোজ পৌঁছোয় না। স্বভাবত ভদ্র রোগী এমন গালাগালি করতে পারেন যেন মনে হয় তিনি মদ খেয়েছেন। এই সময় রোগীকে জলে গ্লুকোজ গুলে খাওয়াতে হয়।

হাইপোগ্লাইসিমিয়া তীব্র হলে রোগী অচেতন হয়ে যান, তাঁর মৃগীর মতো খিঁচুনি হতে পারে। এই সময় তাঁকে মুখে গ্লুকোজ খাওয়ানো যায় না।

এই অবস্থায় গ্লুকাগন ইঞ্জেকশন দিলে মাংসপেশি ও লিভারে জমা গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ রক্তে আসে। ডাক্তার রোগীর শিরায় গ্লুকোজের দ্রবণ দিয়েও হাইপোগ্লাইসিমিয়া ঠিক করতে পারেন।

ডায়াবেটিসের আরও হঠাৎ করে হওয়া জটিলতা

➢ ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস

এই অবস্থায় রক্তে অ্যাসিড জমে আর প্রস্রাবের সঙ্গে কিটোন বার হয়। প্রথমে বারবার পেচ্ছাপ হওয়া, খুব তেষ্টা পাওয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড ক্লান্তি, গা-বমি ভাব ও বমি হয়। চিকিৎসা সময়ে না হলে ঝিমুনি ভাব ও পরে গভীর অচেতনতা হয়। এই অবস্থার যথাযথ চিকিৎসা না হলে প্রাণহানি হতে পারে।

➢ হাইপার-অসমোলার ননকিটোটিক কোমা

এই অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খুব বেড়ে যায়, শরীর জলশূন্য হয়ে যায়, রোগী অচেতন হয়ে যান। এই অবস্থারও দ্রুত চিকিৎসা হওয়া দরকার।

ডায়াবেটিসে নজরদারি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস সারে না। তাই সারা জীবন মাঝে মাঝে ডাক্তারি পরীক্ষা ও ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে দেখতে হয় রোগ কতটা নিয়ন্ত্রণে আছে। প্রথম বার ডাক্তারি পরীক্ষা ও রক্ত-পরীক্ষার পর চিকিৎসা শুরু করা হয়। তারপর মাসে বা দু-মাসে একবার ডাক্তারি পরীক্ষা ও রক্ত-পরীক্ষা করে দেখা দরকার—

- রোগী নির্দেশ মানছেন কিনা।
- ডাক্তারি পরীক্ষায় যে সব জটিলতা ধরা পড়ে তেমন কিছু হচ্ছে কিনা।
- রক্তচাপ কত? সিস্টোলিক রক্ত-চাপ ১০০ থেকে ১৩০ মিমি পারদ এবং ডায়াস্টোলিক রক্ত-চাপ ৬০ থেকে ৮০ মিমি পারদ থাকা ভালো।
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা খালি পেটে ৮০ থেকে ১২০ এবং সকালে জলখাবার খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ৮০ থেকে ১৬০ মিলিগ্রাম প্রতি ডেসিলিটারে থাকা ভালো।
- পয়সায় কুলোলে দুই মাস ছাড়া গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করালে আগের দুই মাসে রক্ত-শর্করার নিয়ন্ত্রণ কেমন ছিল জানা যায়।
- রক্তে চর্বির মাত্রা দেখার জন্য লিপিড প্রোফাইল বছরে একবার করানো গেলে ভালো।
- মোটা মানুষদের বছরে একবার রক্ত রসের ইউরিক অ্যাসিড মাপা উচিত।
- কিডনি ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা দেখার জন্য বছরে অন্তত একবার রক্তের ক্রিয়েটিনিন মাপা দরকার।
- ডায়াবেটিস ধরা পড়ার সময় এবং তারপর ৬ মাস ছাড়া চোখ ও স্নায়ু পরীক্ষা করানো দরকার যাতে কোনো জটিলতা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- হার্টের অসুখ হচ্ছে কিনা বোঝার জন্য প্রথমে একবার, তারপর কোনো উপসর্গ না থাকলেও বছরে একবার ইসিজি করা দরকার।

শেষ কথা

এই হল ডায়াবেটিস নিয়ে মোটামুটি জানার কথা। অনেক কিছুই অবশ্য বলা হল না। একটা জিনিস বুঝতেই পারছেন—ডায়াবেটিসের চিকিৎসা ব্যয়বহুল। পরীক্ষানিরীক্ষা, ওষুধ সবই দামি। ডায়াবেটিস হলে গরিব মানুষজনের খুব সমস্যা। কয়েক বছর আগেও সরকারি কিছু হাসপাতালে রোগী বিনামূল্যে ইনসুলিন পেতেন, এখন আর পান না। সরকার সব নাগরিকের স্বাস্থ্য-রক্ষার দায়িত্ব না নিলে গরিব ডায়াবেটিস রোগীর বেঁচে থাকাই দুষ্কর। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় একটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য ক্লিনিকের সর্বক্ষণের চিকিৎসক।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

চেনা ওষুধ অজানা কথা

অ্যাটেনোলল (Atenolol)

বিশেষ সতর্কতা

ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে অ্যাটেনোলল বন্ধ করবেন না। হঠাৎ করে এ ওষুধ বন্ধ করলে বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, হার্টের স্পন্দন অনিয়মিত হতে পারে। বন্ধ করতে হলে ডাক্তার আস্তে আস্তে ওষুধের মাত্রা কমাবেন।

এ ওষুধ কেন খেতে হয়?

কেবল অ্যাটেনোলল বা অন্য ওষুধের সঙ্গে অ্যাটেনোলল ব্যবহার করা হয় উচ্চ রক্তচাপ কমাতে। এ ছাড়া হার্টের ব্যথা (অ্যান্জাইনা) হওয়া আটকাতে ও হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসায় এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। অ্যাটেনোলল যে শ্রেণির ওষুধ সেগুলোকে বলা হয় বিটা ব্লকার। এরা হার্টের সংকোচনের গতি কমায় আর রক্তনালীগুলোকে ঢিলে করে দেয় যাতে হার্টকে জোরে পাম্প করতে না হয়।

আধকপালি মাথাব্যথা, মদ খাওয়া বন্ধ করার প্রতিক্রিয়া (alcohol withdrawal), হার্টের বিকলতা (heart failure) এবং অনিয়মিত হৃদ্স্পন্দন-এর চিকিৎসাতে অ্যাটেনোলল ব্যবহার করা হয়।

এ ওষুধ কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

মুখে খাবার বড়ি হিসেবে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়, দিনে একবার বা দু-বার খেতে হয়। ২৫ মিলিগ্রাম, ৫০মিলিগ্রাম ও ১০০ মিলিগ্রাম বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়। ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ খান, নিজের ইচ্ছামতো কম বা বেশি মাত্রায় খাবেন না। মনে রাখতে যাতে সুবিধা হয় তাই দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়েই খান।

অ্যাটেনোলল উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টের ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে কিন্তু রোগটা সারিয়ে দেয় না। ওষুধের পুরো ফল পেতে ওষুধ শুরু করার পর ১-২ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। শরীর সুস্থ লাগলেও অ্যাটেনোলল খেয়ে যান। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা বিপজ্জনক।

ওষুধ ব্যবহারের কী কী সাবধানতা নিতে হবে?

- অ্যাটেনোলল বা অন্য কোনো ওষুধে আপনার অ্যালার্জি আছে কিনা ডাক্তারকে বলুন।
- আর কী কী ওষুধ খাচ্ছেন তাও ডাক্তারকে জানান, ওষুধগুলোর মাত্রা বদলাতে হতে পারে।
- আপনার হাঁপানি বা অন্য ফুসফুসের অসুখ, ডায়াবেটিস, তীব্র অ্যালার্জি, হাইপারথাইরয়েডিজম, ফিওক্রোমোসাইটোমা, হার্টের বিকলতা, কম নাড়ির গতি, রক্তসংবহন তন্ত্রের সমস্যা, হার্ট বা কিডনির অসুখ আছে কিনা, আগে কখনো হয়েছিল কিনা ডাক্তারকে জানান।
- আপনি গর্ভবতী কিনা, বাচ্চা চাইছেন কিনা বা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন কিনা জানান। ওষুধ চলাকালীন গর্ভবতী হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানান।
- যদি আপনার কোনো অপারেশন বা দাঁতের চিকিৎসা হওয়ার থাকে, তাহলে ডাক্তারকে জানান যে আপনি অ্যাটেনোলল খাচ্ছেন।
- আপনার জানা উচিত যে অন্যান্য কিছুতে অ্যালার্জি থাকলে অ্যাটেনোলল চলাকালীন সেই অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র হতে পারে, সাধারণ মাত্রার অ্যালার্জির ওষুধে কাজ নাও হতে পারে।

খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

উচ্চ রক্তচাপের জন্য আপনাকে কম নুন খেতে হবে।

ওষুধের একটা মাত্রা খেতে ভুলে গেলে কী করবেন?

মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাটা খেয়ে নিন। যদি পরের মাত্রার সময় প্রায় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভুলে যাওয়া মাত্রা খাওয়া দরকার নেই। দ্বিগুণ মাত্রায় ওষুধ খাবেন না।

এ ওষুধে কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে?

ঝিমুনি, মাথা হালকা লাগা, ক্লান্তি, আচ্ছন্নভাব, অবসাদ, পেটের সমস্যা, পাতলা পায়খানা।

কিছু কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গুরুতর, সেগুলো হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে হবে:

শ্বাসকষ্ট, হাত-পা-গোড়ালি ফুলে যাওয়া, ওজন অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া, মূর্ছা।

ওষুধ কীভাবে রাখতে হবে?

বেশি গরম ও স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখবেন না। একটা কৌটোয় বন্ধ করে রাখলে ভালো।

ওষুধের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে

যে উপসর্গগুলো হয়—শক্তির অভাব, শ্বাস নিতে কষ্ট, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, হার্টের গতি কমে যাওয়া, মূর্ছা, হাত-পা-গোড়ালি ফুলে যাওয়া, ওজন অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া, কাঁপতে থাকা, ঝিমুনি, বুক ধড়ফড় করা, ঘাম দেওয়া বা বিভ্রান্তি, চোখে ধোঁয়াটে দেখা, মাথাব্যথা, মুখে অসাড় বা ঝিনঝিনি ভাব, দুর্বলতা, খুব বেশি ক্লান্তি, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, হঠাৎ করে খিদে পাওয়া।

আরও জানার কথা

ডাক্তার যেমন যেমন দেখাতে বলবেন দেখাতে হবে। নিয়মিত আপনার রক্তচাপ মাপা দরকার। মাঝে মধ্যে রক্ত পরীক্ষারও দরকার হতে পারে।

আর কাউকে আপনার ওষুধ খেতে দেবেন না, তাঁর বিপদ হতে পারে।

অধিকার ছিনিয়েই নিতে হয়

সাপের কামড়-খাওয়া রোগীর চিকিৎসায় অধিকার যেমন ছিনিয়ে নেওয়া দরকার, তেমনই মৃত্যুর পরে তাঁর পরিবারের সামান্য ক্ষতিপূরণের অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া গতি নেই—লিখছেন সৌম্য সেনগুপ্ত

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র ডিসেম্বর ২০১৪-জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায় ''একটি মৃত্যুর ময়নাতদন্ত'' শীর্ষক লেখায় আপনারা পড়েছেন, গত ২ আগস্ট ২০১৪ কেউটের কামড়ের আধঘণ্টার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে মালতী দেবী লোহারকে ভর্তি করা হয়েছিল। বিষধর সাপের কামড়ে অন্তত ১০ ভায়াল এ.ভি.এস. দেবার সরকারি নির্দেশনামা আছে, কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক মাত্র ৫ ভায়াল এ.ভি.এস. দিয়ে রোগীকে রেফার করে দেন। এ ছাড়া, ফণাধর স্নায়ু-বিষসম্পন্ন সাপের (যেমন গোখরো ও কেউটে) কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিওস্টিগমিন ও অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকশন অবশ্যই দিতে হবে বলে সরকারি নির্দেশনামায় লেখা আছে, কিন্তু এই চিকিৎসক সেটাও দেননি। রেফার করার পর মালতীদেবী বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যাবার পথেই মারা যান; সাপের কামড়ের মাত্র আড়াই ঘণ্টারও কম সময়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র ওই প্রতিবেদনে আপনারা জেনেছেন প্রতিটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের কামড়ের আদর্শ চিকিৎসা-বিধি (স্নেক বাইট ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল) টাঙানো থাকার কথা। সেই চিকিৎসা-বিধিতে স্পষ্ট লেখা আছে—নেভার রেফার বিফোর ইনফিউসন অফ ১০ ভায়ালস অফ এ.ভি.এস. (১০ ভায়াল এ.ভি.এস. না দিয়ে রোগীকে কক্ষনো রেফার করবেন না)। সেখানে লেখা আছে, স্নায়ু-বিষসম্পন্ন সাপের কামড়ের লক্ষণ থাকলে রোগীকে নিওস্টিগমিন ও অ্যাট্রোপিন অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের কোনো দেওয়ালে 'স্নেক বাইট ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল' টাঙানো ছিল না।

সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবার এককালীন ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আইনত অধিকারী, এবং সেক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। সানস্ট্রোক, বজ্রপাত ও হাতির দ্বারা আঘাতে মৃত ব্যক্তির পরিবারও এই ক্ষতিপূরণের অধিকারী।

৮-৮-২০১৪-তে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির রাধানগর শাখার পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস-কে চারটি অভিযোগ লিখিতভাবে ফ্যাক্স করা হয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে IPC 304A ও Indian Medical Council (Professional conduct etiquette & ethics) regulations, 2002, section 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1 & 2.4 অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগের প্রতিলিপি প্রেরণ করা হয়।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র ওই প্রতিবেদনে আপনারা জেনেছেন এত কিছুর পরেও মালতী দেবীর পোস্টমর্টেম রিপোর্টে-এ মৃত্যুর কারণ দর্শানো হয় 'অজানা কামড়'। তাই ৮-৯-২০১৪ মৃত্যুর কারণ যে 'সাপের কামড়', এই মর্মে একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য মালতী দেবীর পরিবারের তরফে শ্রীচণ্ডী লোহার বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কাছে আবেদন জানান। সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবার পশ্চিমবঙ্গের ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আইনত অধিকারী, এবং সেক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। এই লেখার সঙ্গে সেই অর্ডারের একটি কপি দেওয়া হল। জেনে রাখুন সানস্ট্রোক, বজ্রপাত ও হাতির দ্বারা আঘাতে মৃত ব্যক্তির পরিবারও এই ক্ষতিপূরণের অধিকারী।

১২-০৯-২০১৪ বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল থেকে লিখিতভাবে জানানো হয় যে মৃত্যুর কারণ সাপের কামড়। সেখানে (মেমো নং ১৯০৯, তারিখ ১২-৯-২০১৪) ওই হাসপাতালের অটোপ্সি সার্জেন লিখিতভাবেই এ কথা জানান। ২২-০৯-২০১৪ সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর পৌরসভায়। প্রথমে কর্তব্যরত অফিসার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট চান, কিন্তু উক্ত অর্ডারের কপি দেখে তিনি স্বীকার করেন, না, পোস্টমর্টেম রিপোর্টের দরকার নেই, এবং জানান যে এই বিষয়টি তিনিও এই প্রথম জানলেন। ৬-৯-২০১৫ প্রায় ১ বছর পর ক্ষতিপূরণের টাকা পেলেন মালতী দেবীর পরিবার।

শেষের কথা ঘটনা পরম্পরা থেকে আমরা আবারও উপলব্ধি করতে পারি— ''অধিকার কেড়ে নিতে হয়''! কিন্তু সেটা না হয় ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারের ক্ষেত্রে কেড়েই নেওয়া হল, কিন্তু মালতী দেবীর, মালতী দেবী-দের বাঁচার অধিকার?

আমরা বিজ্ঞানকর্মীরা যারা সাধারণ শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষদের বোঝানোর চেষ্টা করি—সাপে কামড়ানো রোগীদের ওঝা-গুণিন-পির-ফকির-মনসার থানে নয়, যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে চলুন—তাঁদেরও উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে এটুকু বলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। হাসপাতালে যাতে সাপে-কাটা রোগীসহ সমস্ত রোগীর সঠিক চিকিৎসা হয় তার দাবিও জানাতে হবে।

তাই আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে দাবি জানাই

১. সাপের কামড়ের চিকিৎসা একটি অবহেলিত গ্রামীণ সমস্যা। এটিকে MBBS পাঠক্রমে আরও বেশি গুরুত্বসহ স্থান দিতে হবে।

২. এই মুহূর্তে প্রতিটি হাসপাতালে সাপের কামড়ের আদর্শ চিকিৎসাবিধি (Snake Bite Treatment Protocol)-টি টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

৩. প্রতিটি চিকিৎসককে সাপে কামড়ের চিকিৎসার আদর্শ চিকিৎসা বিধির ট্রেনিং নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. সর্বোপরি সকলের সমস্ত চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির রাধানগর শাখার পক্ষে সৌম্য সেনগুপ্ত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Disaster Management Department
Writers's Buildings, Kolkata 700001

No. 1561(19)F.R./4P-3/04 Dt.19.8.2008

From: Joint Secretary to the Govt. of West Bengal.

Sub: Waiving of Post-mortem for payment of Ex-Gratia in case of death due to snake bite.

Sir,

As per the prevailing G.O. of this Department issued under No. 1773(40)=FR/RL/)/VIII/8P-2/90(Pt.I)Dt Kol-1, the 26th August 2002, post-mortem is mandatory for issuing sanction order of Ex-Gratia Grant to the next of kins of the persons, who had died due to natural calamities. Death due to snake bite / sun stroke was not included then.

Post-mortem report which is a sine qua non for being entitled to this grant, has been reported to be a very time consuming matter in case of death due to snake bite, as the government doctor who attends post-mortem, defers opinion as the cause of death in the Post-mortem Report and refers for visera report. This leads to inordinate delay which defeats the very purpose of payment of Ex-gratia Grant in those cases where the patient of snake bite was admitted into a government health centre/ hospital and where the attending government doctor issued a medical certificate mentioning that snake bite caused the death.

Satisfaction of the District Magistrate is important in this case. Circumstantial evidence like the medical report as mentioned above may be relied upon in absence of post mortem report. Accordingly, I am directed to inform you that where all other documents as mentioned in this Department's above mentioned G.O. have been furnished along with this medical report, the District Magistrates may sanction Ex-Gratia Grant with out pressing for post-mortem report on the basis of the medical certificate issued by the government doctor of the government health centre/hospital where the person concerned was admitted and treated before expiry.

Yours faithfully
(Joint Secretary)

সাপের কামড়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য পোস্টমর্টেম রিপোর্ট প্রয়োজন নয়।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

মারবে কেন তবে?

এষা মিত্র

আমি জন্মালাম।
আমার হাত-পা হয়েছে।
মা যা খায়, আমিও তাই খাই
ওয়াও! আমি মেয়ে!
আমি মরে গেছি। বাবা-মা আমাকে মেরে ফেলেছে।

কেন্দ্রীয় নারীকল্যাণ মন্ত্রকের তৈরি এই স্লাইড-ভিডিও দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল এক পরিচিত যুবকের কথা। তাঁর স্ত্রীকে ডাক্তার বলেছিলেন, ''বাচ্চা আপনার মতোই হবে।'' তারপর? কন্যাসন্তানটি এখন প্রায় দুই বছরের। কিন্তু না-ও তো হতে পারত। উত্তর ভারত বা রাজস্থানের পরিবারের কোনো পরিবারের কন্যাসন্তান হয়তো নিহত ভ্রূণ হয়ে যেতে পারত অনায়াসে। পশ্চিমবঙ্গেও পারত না কি?

গত আগস্টে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দফতরের তরফে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০০১-২০১২, এই দশকে প্রতি বছরে গড়ে ভারতে ৪.৫৬ লক্ষ মেয়ে হারিয়ে যায়! এরা সকলেই সেই নিহত ভ্রূণ বা শিশুকন্যা। ১০০০ ছেলে পিছু ৯৪৮.৭ জন মেয়ের আদর্শ অনুপাত ধরলে স্বাভাবিকভাবে যে সংখ্যক মেয়ে জন্মানোর কথা (ন্যাচারাল সেক্স রেশিও অ্যাট বার্থ) এবং বাস্তবে যত সংখ্যক মেয়ে জন্মেছে (অ্যাকচুয়াল সেক্স রেশিও অ্যাট বার্থ), তার ফারাকটাই এই হারিয়ে যাওয়া কন্যাসংখ্যা! এবং যার মূল কারণ ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা এবং কন্যা হলে তাকে হত্যা করা। স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের আওতায় (পরিসংখ্যান তত্ত্ব অনুসারে, সমীক্ষায় কিছু 'এরর' ধরে নিতে হবে, ফলে এই সংখ্যাকে আক্ষরিক ধরে না নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা বলে মনে করাই ভালো) সংগৃহীত তথ্য আরও জানাচ্ছে, ২০০১-০৬ সালের মধ্যে বছরে গড়ে এমন নিখোঁজ মেয়ের সংখ্যা ছিল ৫.৮ লক্ষ! রাষ্ট্রপুঞ্জের জনসংখ্যা তহবিল সূত্রে এই তথ্য পর্যালোচনা করে বলা হয়েছিল, ২০০৪ সালে সংখ্যাটা ছিল ৭ লক্ষ। পরবর্তী বছরগুলোতে তা কমিয়ে আনা গিয়েছে। ২০০৭-১২র মধ্যে জন্মের আগেই নিখোঁজ মেয়ের সংখ্যা গড়ে ছিল ৩.৩ লক্ষ, ২০১২ সালে সংখ্যাটা তার চেয়ে কম। ২.৯ লক্ষ! ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন, বিভিন্ন সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রচারের কারণে সংখ্যাটা কমিয়ে আনা গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনও অনেকটা পথ বাকি।

দ্য হিন্দু সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, ২০০১-০৬ সালের মধ্যে জন্মের আগেই নিখোঁজদের ৭০ শতাংশ ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে। ২০০৭-১২-র মধ্যে এই রাজ্যগুলির অংশীদারি হয়েছে ৮৩ শতাংশ! অথচ হিমাচল প্রদেশে ২০১১-১৩-র মধ্যে ১০০০ ছেলে পিছু কন্যা জন্মের গড় সংখ্যা ৯৪৩ করা গিয়েছে।

কেন এই জন্মের আগেই হারিয়ে যাওয়া? সেই চিরাচরিত কারণ। বংশরক্ষায় পুত্র চাই। মেয়ে মানেই সংসারের বোঝা ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই যে বলা হয়, ছেলেরা মা চায়, বান্ধবী চায়, স্ত্রী চায় কিন্তু কন্যা চায় না! সে কারণে নুন খাইয়ে বা দুধভরা বাসনের মধ্যে শিশুকন্যার মুখ চেপে ধরে তাকে মেরে ফেলার ট্র্যাডিশন এখনও রয়েছে। মেরে ফেলতে ফেলতে উত্তর ভারতের কিছু জায়গায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে বিয়ের জন্য মেয়েই নেই গ্রামে। ফলে অন্য জায়গা থেকে মেয়ে কিনে আনা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে রাজনৈতিক নেতারা বিয়ের জন্য কন্যার অভাবের কথাই তুলে ধরেন। যার মোদ্দা কথা, মেয়ে হবে শুনলে মেরে ফেলো না বাবা। সকলেই যদি মেয়েকে মেরে ফেলে, বিয়ের জন্য আর মেয়ে পাবে না। কন্যার জন্মে উৎসাহ দিতে সরকারি তরফে কন্যার পিতাদের অর্থকরী গাছের চারা বিলি করা হত, এখনও মাঝেমধ্যে হয়। যাতে মেয়ের বিয়ের বয়স হতে হতে গাছও বড়ো হয় এবং মেয়ের বিয়ের টাকা সেই গাছ বিক্রি করে উঠে আসে। এই দু-ধরনের প্রচার বা কর্মসূচিতেই কিন্তু মেয়েদের জন্মের উদ্দেশ্য দু-টি, বিয়ে এবং বংশবৃদ্ধির যন্ত্র হওয়া। প্রচারকারীরা বলতেই পারেন, বাস্তব যা, সেইমতোই চলতে হবে, সেইমতোই বোঝাতে হবে, যাতে অন্তত কিছু কন্যাকে বাঁচানো যায়। কিন্তু মুশকিল হল, আদতে মেয়েদের জীবন সম্পর্কে সেই পুরোনো ধারণাই যে এর ফলে চারিয়ে যাচ্ছে, সেই 'ভিশাস সার্কল' থেকে বেরোনোর রাস্তাটা কী?

সম্প্রতি কন্যাসন্তানের সঙ্গে সেলফি তুলে পোস্ট করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যা সম্পর্কে চমৎকার প্রশ্ন তুলেছেন মহারাষ্ট্রের সমাজকর্মী বর্ষা দেশপাণ্ডে। তিনি বলেছেন, 'গোড়াতেই গলদ। যাকে জন্মাতেই দেওয়া হল না, তার সঙ্গে আবার সেলফি কীসের?'

যদিও প্রধানমন্ত্রী যাঁর কর্মসূচি থেকে এই পরিকল্পনাটি ধার করেছেন, হরিয়ানার বিবিপুরের সেই সরপঞ্চ সুনীল জাগলান কিন্তু তাঁর কর্মসূচির সপক্ষে জানিয়েছিলেন, দু-টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এক, তাঁর গ্রামে কোনো পরিবারে মেয়েদের ফোটো তোলা হয় না। সেকারণে ছবিতে মেয়েদের দৃশ্যমান করতে তাঁর এই পরিকল্পনা। যার উদ্দেশ্য কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা। দুই, তাঁর নিজের প্রথম কন্যা জন্মানোর পর হাসপাতালের সিস্টারেরা মিষ্টি খাওয়ার টাকা নিতে চাননি। কারণ, ছেলে হয়নি। গ্রামে এই বৈষম্য দূর করতেই সেলফি উইথ ডটারের কর্মসূচি চালু করেছেন তিনি। পণপ্রথার বিরুদ্ধেও প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

কিন্তু মুশকিলটা হল, সেলফি-প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ওই কর্মসূচির আহ্বান জানানোর পর থেকে নেটিজেনরা নিজেদের কন্যার সঙ্গে ছবি তুলে হু হু করে পোস্ট করতে লাগলেন। দিনকয়েক সেই হুজুগ চলল। তারপর থিতিয়ে গেল। ভাবার বিষয়, যেখানে জন্মানোর আগেই বা জন্মানোর পরে প্রাগৈতিহাসিক কায়দায় কন্যাসন্তানকে হত্যা করা হয়, খাপ নিদানে মেয়েদের পোশাক-আশাক, মোবাইল ব্যবহার, হাঁটাচলা বন্ধ হয়, তথাকথিত বংশের সম্মানরক্ষায় হত্যা করা হয় নির্বিচারে, যেখানে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে লেখা থাকে মেয়েরা চাকরি করছেন বলেই বেকারত্ব বাড়ছে, সেখানে হুজুগে,

সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর সেলফি প্রচারের মূল্য কতটুকু? কেন্দ্রের বেটি বচাও, বেটি পড়াওয়ের ঢাকঢোল প্রধানমন্ত্রী নিজেই বাজিয়ে চলেছেন। কিন্তু কাজ হচ্ছে কতটা? পশ্চিমবঙ্গে কন্যাশ্রী প্রকল্পের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর

ভ্রূণের লিঙ্গপরীক্ষা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের শহরে শহরে এই ব্যাবসা যে দস্তুর মতো চলছে, তার দায় কি শহুরে নাগরিকদের নয়?

ভোটের বাজারে তা ফলপ্রসুও হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু মেয়েদের সম্মানরক্ষায় বা সেই বোধ তৈরিতে সরকার বা সরকার-পোষ্যদের কার্যকলাপ ঠিক বিপরীত।

আর শুধুই কি সরকার? আমরা যারা কথায় কথায় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলতে দ্বিধা করি না, তাঁদের মনোভাব যে কী, লেখার শুরুতে বলা চিকিৎসকের মানসিকতাই তা বুঝিয়ে দেয়। ভ্রূণের লিঙ্গপরীক্ষা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের শহরে শহরে এই ব্যাবসা যে দস্তুর মতো চলছে, তার দায় কি শহুরে নাগরিকদের নয়? চিকিৎসক এবং পরিবার, দোষ তো উভয় পক্ষের। সেই মানসিকতা, লোভ দূর করবেন কে?

এক ভাবী বাবার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। লেখার শেষে দুই বাবার কথা মনে পড়ছে। বছর কয়েক আগে কেরলে বেড়াতে গিয়ে যে গাড়ি ভাড়া করেছিলাম, তার যুবক ড্রাইভারকে শুনেছিলাম সকাল-বিকেল বিমা সংস্থার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। নিজেই জানিয়েছিলেন, মেয়ের জন্য বিমা করাচ্ছেন। যাতে বিয়ের সময় পণের টাকার কিছুটা অন্তত জোগাড় হয়। কন্যার বয়স তখন মাত্র দেড় বছর! এ-ও বলেছিলেন, শিক্ষিত কেরলে প্রত্যেক ধর্মের মেয়েদের ক্ষেত্রে পণপ্রথা চালু রয়েছে। কোথাও শুধু টাকা, কোথাও টাকার সঙ্গে চাই সোনাও।

এক পাঁচ বছরের কন্যার বাবা লিখেছিলেন, 'মেয়ের বাবা হিসেবে এখন একটাই প্রার্থনা ছেলেদের টেস্টোটেরন ক্ষরণ যেন অতিরিক্ত না হয়।' তিনি কলকাতার। শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, যৌনপল্লিতে পাচার ইত্যাদি ইত্যাদির প্রেক্ষিতে তাঁর এই প্রার্থনা।

ফলে কন্যাভাগ্যে কী-বা-দিন, কী বা রাত্রি। হয় জন্মের আগে নিখোঁজ বা জন্মের পরে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখিকা একজন প্রাবন্ধিক

শব্দ-ছক

প্রস্তুতি: রুচিরা মজুমদার

শব্দ-ছক-২

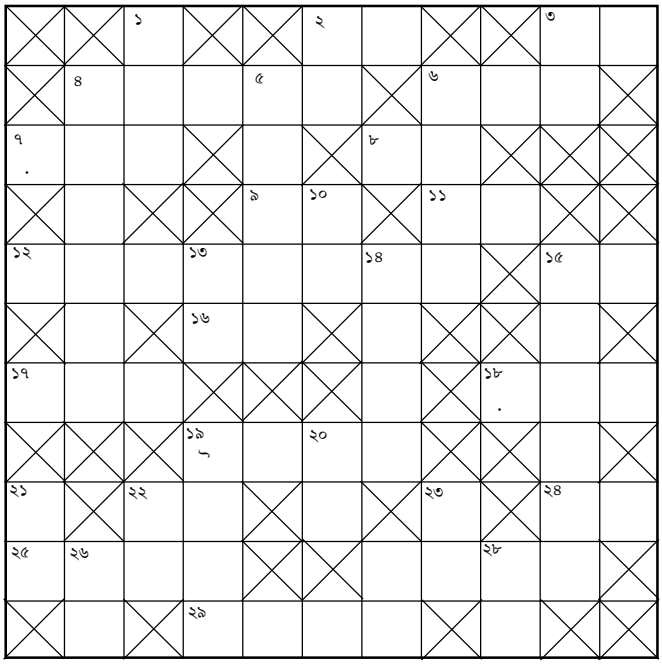

সূত্র:

পাশাপাশি: ২। অনেকে এর সাদা অংশটুকু খান। ৩— কার্ডিয়োগ্রাম। ৪। জলবসন্ত। ৬। এই অসুখে মাথা ঘোরে। ৭। ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে হয়। ৮। মানসিক রোগীদের এটা হতে পারে। ৯। এটা বাজাতে হলে ঠোঁট গোল করতে হবে। ১১। খাদ্যশস্য। ১২। জীওল মাছ। ১৩। রক্তে চিনি বেশি হলে। ১৫। এরপরে জাইম বসালে হজম হয়ে যাবে। ১৬। অপুষ্ট বাচ্চাদের জন্য এই জ্বর মারাত্মক হতে পারে। ১৭। এটা রোজই করা ভালো। ১৮। কিডনির কাজ। ১৯। যেখানে সাইনুসাইটিস হয়। ২২। এর থেকে প্রোটিন মেলে। ২৪। টাকার মতো এও ব্যাঙ্কে পাওয়া যায়। ২৫। জন্মনিরোধক। ২৭। স্থূলত্ব। ২৯। এই ফোঁড়ার একটা মুখ নয়।

উপর নীচ: ১। বল ও—অস্থিসন্ধি ২। পরে রে বসালে পাওয়া যাবে ভেতরের ছবি। ৩। এটা বাড়লে মুশকিল। ৪। এই অসুখের শুরুতেও মুরগি। ৫। শরীরে এই খনিজ দরকার। ৬। মানুষের অসুখের কারণ কমপিউটারেরও ১০। যক্ষ্মা। ১৩। মিথ্যে বা ফেল-এর আগে বসে। ১৪। এর প্রতিষেধক না নেওয়া থাকলে কেটে গেলে বিপদ হতে পারে। ১৫। হরমোন প্রতিস্থাপন। ১৯। যন্ত্রণাদায়ক। ২০। নাক। ২১। এই ঢেঁকুর ওঠে 'অ্যাসিড' হলে। ২২। ঘন দুধের ওপর দেখা যায়। ২৩। সদ্য। ২৬। তামাক ও এটা কম খান। ২৭। খেতে হলে পাতে তেঁতুল রাখুন। ২৮।—স্ক্যান।

উত্তর ১৬ পাতায়

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

সুপ্রিম কোর্ট বাণিজ্যিক সারোগেসি নিষেধের ইঙ্গিত দিলেন

ইউনাইটেড নেশনস ২০১২ সালে এক সমীক্ষা করে জানিয়েছিল, সে সময় এই দেশে ৩০০০-এর ওপর 'ফার্টিলিটি ক্লিনিক' ছিল, আর বাণিজ্যিক সারোগেসি ব্যাবসার বার্ষিক লেনদেন ছিল ৪০০ মিলিয়ন ডলার।

ভারত ক্রমে সারোগেসি ট্যুরিজম-এর লক্ষ্য দেশ হয়ে উঠছে, আর এতে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বিগ্ন। গত ১৪ অক্টোবর ২০১৫ বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি এন ভি রামান্না এই দু-জনের 'বেঞ্চ' জানিয়েছে, সারোগেসি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে কোনো আইন নেই; এবং সরকারকে এ ব্যাপারে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটা নোটিশ জারি করেছিল, তাতে বলা ছিল যে কৃত্রিম জন্মদানের কাজে লাগানোর জন্য মানবভ্রূণ এ দেশে বাইরে থেকে নিয়ে আসা যাবে। এর ফল হয়েছে এই যে বিদেশিরা এখানে হিমায়িত ভ্রূণ নিয়ে এসে এদেশের নারীর 'গর্ভ ভাড়া' করছেন।

বিদেশিরা এখানে হিমায়িত ভ্রূণ নিয়ে এসে এদেশের নারীর 'গর্ভ ভাড়া' করছেন।

''বাণিজ্যিক সারোগেসি মেনে নেওয়া উচিত নয়, কিন্তু এ দেশে এটা চলছে। আমরা মানবভ্রূণের লেনদেন করতে দিচ্ছি। এটা ব্যাবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর থেকে 'সারোগেসি ট্যুরিজম' তৈরি হয়েছে।''—সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ এরকমই বলছে। সরকার এ ব্যাপারে জানিয়েছেন যে একটা 'সারোগেসি বিল' আনার কাজ চলছে। সলিসিটর জেনারেল রঞ্জিত কুমার জানিয়েছেন, কয়েক মাসের মধ্যেই লোকসভায় এই বিল আসবে, আর তার জন্য আলোচনা চলছে।

একজন নারী যখন তাঁর ডিম্বাণু দেন ও তার থেকে বাণিজ্যিক সারোগেসি-র মাধ্যমে শিশু জন্মায়, তখন সেই নারীকে ওই শিশুর একমাত্র মা বলা যাবে, নাকি ডিম্বাণুদাতা মা ও গর্ভধারণকারী মা, দু-জনেই সেই শিশুর মা হবেন—এ ব্যাপারে কোর্ট সরকারকে স্পষ্ট অবস্থান নিতে বলেছে। ''বাণিজ্যিক সারোগেসি মানে কি গর্ভ ভাড়া দেওয়া, এবং বাণিজ্যিক সারোগেসি কি অনৈতিক কাজ, ফলত তা কি রাষ্ট্রের জননীতি বিরোধী ও ফলে বিবেচনা-অযোগ্য?'' বিচারপতিরা বেঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন। তাঁরা সরকারের কাছে আরও জানতে চেয়েছেন, বাণিজ্যিক সারোগেসি কি গর্ভধারণকারী 'সারোগেট মা'-এর আর্থিক ও মানসিক শোষণ, আর এটা কি নারীত্বের অসম্মান?

বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, মানবভ্রূণ-র 'আমদানি' কি মানবজীবনকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা? এবং সারেগেট শিশুর মানবাধিকার কি এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে, কেননা সে শিশুর মানসিক ও আবেগজনিত সমস্যা হতে পারে? কোর্ট বলেছে, যদি সারোগেট শিশুটি শারীরিক বা মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক না হয় ও যাঁরা সারোগেট বাচ্চা নেবার জন্য চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা যদি এমন অবস্থায় শিশুটিকে না নেন, তাহলে তার কী দশা হবে সে ব্যাপারে কোনো আইনি নির্দেশ নেই। কোর্ট সরকারকে বলেছে, এসব ব্যাপার খতিয়ে দেখে প্রস্তাবিত আইনে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। ''আমাদের মনে হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যাপারের সমস্ত দিক খুব সময় দিয়ে বিবেচনা করে, দরকার হলে আগেকার নোটিশের পুনর্বিবেচনা করে, ২৮ অক্টোবর আবার কোর্টে আসতে হবে। কোর্ট জানিয়েছে।

ভারতের 'ল কমিশন' তাঁদের ২২৮তম রিপোর্টে বলেছিলেন, বাণিজ্যিকভাবে সারোগেসি না হওয়াই ভালো। কমিশন বলেছিলেন, সারোগেট মা ও যাঁরা বাচ্চা চাইছেন, তাঁদের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে সারোগেসি হতে পারে। এই চুক্তিতে সারোগেট মা-এর স্বেচ্ছা-সম্মতি, তাঁর স্বামী ও পরিবারের অন্যদের সম্মতি, শিশুকে গর্ভধারণ করার জন্য সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেওয়া, এবং জন্মের পর শিশুকে, বাচ্চা চাইছেন যাঁরা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া—ইত্যাদি সমস্তই থাকবে। ল কমিশন বলছিলেন, সারোগেট বাচ্চার জন্ম সার্টিফিকেটে 'বাচ্চা-চাওয়া পিতামাতা'র নামই পিতামাতা হিসেবে থাকবে। 'বাচ্চা-চাওয়া পিতামাতা' (কমিশনিং পেরেন্টস) হলেন তাঁরা, যাঁরা গর্ভধারণ করেননি বা করতে পারেননি, কিন্তু শিশু চেয়ে সারোগেট মা-এর সাহায্য নিয়েছিলেন। কমিশন সরকারকে বলেছিলেন, এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন সারোগেট শিশু বাচ্চা-চাওয়া পিতামাতার শিশু হিসেবে সমস্ত আইনি অধিকার পায়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৫ অক্টোবর ২০১৫
http://timesofindia.indiatimes.com/india/SC-suggests-ban-on-commercial-surrogacy/articleshow/49365734.cms

মাথা ঘুরলে ব্লাড প্রেশারের ওষুধ বন্ধ?

হঠাৎ বনবন করে বা বোঁ করে মাথা ঘুরে গেল নাকি? ব্লাডপ্রেসারের ওষুধটা বন্ধ করার আগে একটু ভেবে দেখুন—লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

মাঝ বয়স অতিক্রম করলে মাথা ঘুরে যাওয়াটা একটা নিত্য-নৈমিত্যিক ঘটনা। কিন্তু মাথা বলে কথা! অল্প সময়ের জন্য মাথা ঘুরলেও একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে সারাদিন ঘুরপাক খেতে থাকে। মাথা ঘুরলে সাধারণ বুদ্ধিও জট পাকিয়ে যায়, বা শিবরামের ঢং-এ বলতে পারি, মাথা টললে মাথা কাজ করে না, বুদ্ধি টসকে যায়।

কিন্তু কেন ঘুরল মাথা?

আমরা কিনা এখন সবাই বেশ শিক্ষিত, তার ওপর বৈজ্ঞানিক কারণ ছাড়া কোনো কিছু মানতে চাই না। তাই সবার আগেই রক্তচাপের কথা মনে পড়ে। প্রেশার ফল্ট নয় তো? কী বললেন—কথাটা 'প্রেশার ফল' হবে, 'প্রেশার ফল্ট' নয়? অ, ওই হল, একে মাথা ঘুরছে, তার ওপর ফল্ট নিয়ে ফল্ট ধরা—ঠিক আছে, বুঝেছি, মাথা ঘুরছে 'প্রেশার ফল' অর্থাৎ রক্তচাপ কমে যাওয়ায়, তাই তো? কী বললেন? না, প্রেশার কমে যাওয়াও নয়? তাহলে?

হ্যাঁ, তাহলে দুই খান কথা আছে। আপনি মাথা ঘোরাকে খুব গুরুত্ব দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। যদি তেমন গুরুত্ব না দেন, তো আপনি তড়িঘড়ি কোনো কিছু করলেনই না। আর মাথা ঘোরা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে একে-তাকে বললেন, নানা উপদেশ মাথায় ঢুকল। তবে প্রায় সব্বাই একটা কথা বলবেনই, ব্লাড প্রেশারটা এখনই দেখিয়ে নাও। নাগালের মধ্যে রক্তচাপ মাপার কোনো ডাক্তার বা কম্পাউন্ডার বা পাড়ার বোসদা যিনি জনসেবার একটা অঙ্গ হিসেবে নিজেই ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্রটা বাড়িতে রাখেন, এঁদের পাওয়া গেল। রক্তচাপ মাপার যন্ত্র সস্তা আর মাপার কৌশল জটিল নয়, তাই শহর-আধাশহরে রক্তচাপ মাপায় কুশলীদের অভাব সাধারণত থাকে না। কিন্তু এখানে একখান কথা আছে। যাঁরা রক্তচাপ মেপে দিতে পারেন নির্ভুলভাবেই, তাঁরাও এই কথা জানেন না, বা জানলেও তেমন খেয়াল রাখেন না। সে কথাটা হল, অভিজ্ঞ ডাক্তাররাও একবার মেপে অস্বাভাবিক রক্তচাপ নির্ণয় করলে, পরে দুই বা তিনবার সেটা মেপে দেখে তবেই নিশ্চিত হন। অর্থাৎ রক্তচাপ মাপা সহজ হলেও, একবার সেটা নির্ভুলভাবে মাপতে পারলেও, সেটাই যথেষ্ট নয়। রক্তচাপ একবার মেপে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পেলেই হল না, সেটা কয়েকবার না মাপলে সাধারণভাবে আপনার রক্তচাপ ঠিক কত, সেটা বলা যায় না।

এইবার আসি এ-গল্পের আসল মুশকিলের কথায়। আপনি শ্রীমতী ক, আপনার হাই ব্লাড প্রেশার আছে, যাকে বাংলায় বলে উচ্চ রক্তচাপ। আর আপনি তার জন্য ওষুধ খাচ্ছিলেন, সেটা খেয়ে প্রেশার ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু ওই যে, মাথা ঘুরল, আর বোসদা দেখলেন, আপনার রক্তচাপ কম! ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে হাতে গরম সাড়ে ছয় হয়ে গেল। বোসদার বিপি-যন্ত্র ঠিক আছে কিনা, তাঁর মাপতে ভুল হল কিনা, আরও দু-তিনবার মাপার প্রয়োজন আছে কিনা, সেসব ভেবেও দেখলেন না আপনি। আজকালকার ডাক্তাররা কথায় কথায় ভারী কড়া ওষুধ দিয়ে দেয়, সেটা তো পাড়ার আট থেকে আশি সব্বাই জানে। আপনি, অতএব, আর 'বেকার রিস্ক' নিলেন না, দিলেন ব্লাড প্রেশারের ওষুধটা ঝাঁ করে বন্ধ করে। মাথা ঘোরাও কমে গেল একবেলার মধ্যে। পরের দিন অফিসে গিয়ে গুছিয়ে বললেন আপনার অভিজ্ঞতা, আর তিন-তিনটে টেবিলের জনতা হাঁ করে আপনার কথা গিলল, যেন মুখার্জি কি সারদা সিরিজে রোমহর্ষক কাহিনি কিছু কম পড়িয়াছে! শেষমেশ বড়োবাবু ফাইল-শেষের তাড়া লাগাতে এসে যখন আপনার মাথা কি বাত শুনে খানিক হাঁ করেই যেন দাঁড়িয়ে থাকলেন, আপনি বুঝলেন, কী ভয়ানক বিপদ থেকে সেরেফ স্বীয় প্রতিভাবলে বেরিয়ে এসেছেন!

এ তো গেল কাহিনি নম্বর এক। এবার ভাবুন দু-নম্বর সম্ভাব্য কাহিনির কথা। আপনি খ-বাবু, মাথা ঘুরেছে, কিন্তু হাতের কাছে রক্তচাপ মাপার তেমন বিশেষজ্ঞ কেউ নেই, আর আপনার উৎকণ্ঠা পাহাড়প্রমাণ। শ্রীমতী ক-এর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা আপনার পরিচিত গণ্ডির মধ্যে বেশ চাউর হয়েছে। তাই আপনি দেখলেন, কে আর খামোকা ডাক্তারকে গাঁটের কড়ি খরচা করে দেখায়, এ তো জলবৎ তরলং যে সে ব্যাটা কড়া ওষুধ দিয়ে ফেলেছে। তবু আপনি ধীর-স্থির ব্যক্তি, তাই সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেবার জন্য পাড়ার অভিজ্ঞ ওষুধ-দোকানদারদের কাছে গেলেন। তিনি বিচক্ষণ মানুষ, আপনাকে বুঝিয়ে দিলেন, ওই যে ৫ মিলিগ্রাম করে রক্তচাপ কমানোর ওষুধটা খাচ্ছেন, সেটা কমিয়ে ২.৫ মিলিগ্রাম করলেই ঠিক হয়। আপনি ওষুধের পাতাটা বদলে আনতে-না-আনতেই ব্যস, মাথা ঘোরা কমে গেল। এর চাইতে বড়ো প্রমাণ আর কী চাই?

শ্রীমতী ক বা শ্রীযুক্ত খ কারোরই খেয়াল হল না যে, রক্তচাপের ওষুধ রক্তচাপ কমানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়। কতটা রক্তচাপ বাড়লে কোন ওষুধ কী ডোজে দেওয়া হবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে, আর ওষুধ দেবার পরে আপনার রক্তচাপ ঠিক কতটা কমল, সেটাও ডাক্তারবাবু মেপে দেখে নিয়েছেন। তাই নিয়মমতো ওষুধ খেয়ে রক্তচাপ ঠিক থাকলে, সেই ওষুধ পরিবর্তনের আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন।

কত কম রক্তচাপ হলে মাথা ঘুরবে?

প্রথমে বোঝা যাক, মাথা ঘোরে কেন। তার আগে একটু আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই—অনেকের ধারণা আছে মাথা ঘোরা আর মূর্ছা যাওয়ার সম্পর্ক অতি গভীর। কিন্তু মাথা ঘোরা ও মূর্ছা যাওয়া তথা জ্ঞান হারানোর মধ্যে অনেকটা ফারাক। জ্ঞান হারানো ব্যাপারটা প্রায়শই বেশ ক্ষতিকারক, চিন্তিত হবার বেশ কারণ আছে। কিন্তু মাথা ঘোরা জিনিসটা কষ্টের, কিন্তু আতঙ্কের নয়। কারণে ও আপাতদৃষ্টিতে অকারণে অল্প সময়ের জন্য বা কিছুক্ষণ সময় ধরে আমাদের মাথাটা ঘুরতে পারে, বা বলা যায়, আমাদের মনে হতেই পারে যে মাথা ঘুরছে। না, আশেপাশের লোকজন সেটা বুঝতে পারে না, মাথাটা তো সত্যিই কিছু আর লাট্টুর মতো ঘুরছে না, মাথা ঘোরার একটা অনুভূতি হচ্ছে মাত্র। চারপাশের সব কিছু ঘুরছে

মনে হচ্ছে। জানালা, দরজা গ্রিল—কিছু একটা ধরে আমরা ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করি। বিছানায় শুয়ে থাকলেও নিষ্কৃতি নেই। মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বমি বমি ভাবও হতে থাকে। এত কিছু হলেও আমাদের জ্ঞান হারায় না।

আমাদের মাথার দু-দিকে কানের ভিতরের দিকের অংশের একটা অংশ 'ককলিয়া' (cochlea)। এর মধ্যে আছে আমাদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষার মূল ভার। ককলিয়া ও এর থেকে যোগাযোগকারী স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের সেরিবেলাম নামক অংশে আমাদের মাথার অবস্থিতির প্রয়োজনীয় সংবেদন বয়ে নিয়ে যায়। তাই চোখ বন্ধ থাকলেও আমরা বুঝতে পারি আমাদের মাথা হেলে আছে না সিধে আছে। মাথা ঘোরার এই রোগলক্ষণ, যার ডাক্তারি নাম 'ভারটাইগো', বিশেষ করে সেটা যদি বেশ কিছুদিন ধরে চলে, তাহলে ককলিয়ার রোগকে সন্দেহের তালিকায় প্রথম দিকেই রাখতে হবে। কালেভদ্রে ককলিয়া ও মস্তিষ্কের মধ্যেকার স্নায়ুর রোগ থেকেও এই একই রোগলক্ষণ দেখা যেতে পারে। এইরকম রোগে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহে কোনো বাধা থাকে না। এতে ভারসাম্য রাখতে না পেরে বড়োজোর দাঁড়িয়ে থাকলে মাটিতে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগতে পারে, চেতনা লুপ্ত হয় না। তাই মাথা ঘুরলে বসে বা শুয়ে পড়াই ভালো।

মাথা ঘুরে অজ্ঞান হওয়াটা অবশ্য অন্য পরিস্থিতি। অজ্ঞান হবার জন্য মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ একটা বিপদসীমার নীচে নেমে যেতে হবে। আমাদের জ্ঞান বজায় থাকে মস্তিষ্কের নীচের দিকে 'ব্রেন স্টেম'-এর 'মেডালা অবলংগাটা' নামক অংশের কাজ ঠিকঠাক চললে। মেডালা অবলংগাটার কাজ ঠিকভাবে চালাতে গেলে সেখানে একটা ন্যূনতম মাত্রায় রক্ত সরবরাহ বজায় থাকা দরকার। এই রক্ত সরবরাহ কমে যেতে পারে মূলত তিনটি প্রধান কারণে। হৃদ্‌যন্ত্র বা হার্ট সাময়িক কারণে স্তব্ধ হয়ে গেলে বা রক্তচাপ বিপদসীমার নীচে নেমে গেলে এমনটি হতে পারে। দেখা গেছে, সাধারণত গড় রক্তচাপ ন্যূনতম ৭০ মিলিমিটারের কম না হলে, নাড়ির গতি প্রতি মিনিটে ৪০-এর কম না হলে রক্ত সরবরাহ কমে যাবার কারণে কেউ অজ্ঞান হন না। আর এ সব ঠিক থাকলে তৃতীয় কারণ হিসেবে মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে বা রক্তনালী ফেটে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে (সেরিব্রাল স্ট্রোক ও হিমোরেজ) আমাদের চেতনা লুপ্ত হতে পারে। এই জ্ঞান হারানোর ব্যাপারটা সাধারণত হঠাৎ হয়, কোনোরকম পূর্বাভাস না দিয়ে। মস্তিষ্কে রক্তসরবরাহ কমে যাবার কারণে অজ্ঞান হবার এই রোগে মাটিতে পড়ে যাওয়াটা সামলানো যায় না। অধিকাংশক্ষেত্রেই শারীরিক আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে—তাই অজ্ঞান হওয়া ব্যাপারটা মাথা ঘোরার 'ভারটাইগো' রোগের মতো নিরীহ নয়। রক্ত চলাচল বিপদসীমার নীচে নেমে যাওয়াটা গুরুতর একটা ব্যাপার। কেবল জ্ঞান হারানোয় এটা থেমে নাও থাকতে পারে। রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষগুলি বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদ পায়, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে সেই রসদের জোগান যায় বন্ধ হয়ে। এরকম অবস্থায় সেই কোষগুলো বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। একটা ন্যূনতম (প্রায় তিন মিনিট), সময়ের মধ্যে রক্ত চলাচল পুনরায় চালু না হলে মস্তিষ্কের রক্ত না-পাওয়া কোষগুলির মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, ককলিয়ার রোগে মাথা ঘোরে অল্প সময়ের জন্য, বা কখনোসখনো কিছুক্ষণ ধরে চলতেও পারে, কিন্তু পাকাপাকি ক্ষতি হয় না।

অর্থাৎ মাথা ঘোরার রোগ হলে, জ্ঞান হারানোর রোগ না হলে, আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। ককলিয়ার রোগ ছাড়াও মাথা ঘোরার সমস্যা হতে পারে। সেগুলো নিয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনায় যাব না। তবে আমাদের মাথা ঘোরার কথা শুনলেই হয় 'লো প্রেশার' নয় 'সারভাইক্যাল স্পন্ডাইলোসিস'-এর কথা মনে হয়। সারভাইক্যাল স্পন্ডাইলোসিস গলা অঞ্চলের মেরুদণ্ডের হাড়গুলোর ক্ষয়জনিত কারণে হয়। মস্তিষ্কের পেছনের অংশে অবস্থিত সেরিবেলাম, যেটি আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করার অন্যতম অঙ্গ, তার প্রয়োজনীয় রক্ত পায় বেজাল ধমনি (basal artery) থেকে। সারভাইক্যাল স্পন্ডাইলোসিসে ভার্টিব্রাল ও বেজাল ধমনির কারণ হিসেবে সারভাইক্যাল স্পনাডাইলোসিস যে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। একটু বেশি বয়সিদের মাথা ঘুরলেই সারভাইক্যাল স্পন্ডাইলোসিস ধরে নিয়ে গলায় কলার পড়ার যে ব্যবস্থা অনেক ডাক্তারবাবুই করেন, সেটা তেমন যুক্তিসম্মত নয়—কিন্তু এই নিয়ে বেশি আলোচনা আজকে করব না।

মাথা ঘোরার সমস্যা হলে কী করণীয়?

প্রধান কারণ হিসেবে কানের ভিতরের অংশের অর্থাৎ ককলিয়ার রোগের অস্তিত্ব আছে কিনা নির্ণয় করতে হবে। এই রোগে অনেক সময় কানে শোনার সমস্যা থাকে। কানে কম শুনতে পাওয়া অথবা একটা এক বা দুই কানে অদ্ভুত রকমের একনাগাড়ে 'ঝিঁ-ঝিঁ' শব্দ শোনা ককলিয়ার রোগের অস্তিত্ব জানান দিতে পারে। এ ছাড়া অন্য রোগ থেকেও মাথা ঘুরতে পারে, আর ভারটাইগো ছাড়াও ডাক্তাররা 'ডিজিনেস' (dizziness) বলে অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করেন, সেটা ভারটাইগো থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হলেও তার বাংলা প্রতিশব্দ 'মাথা ঘোরা'-ই। মাথা ঘুরতে পারে ক্লান্তিতে, না খেয়ে থাকলে, টেনশন থেকে, মনোরোগের লক্ষণ হিসেবে, এবং আরও অনেক কিছুতেই—তালিকাটা বেশ লম্বা। তার সব কিছু এখানে দিলে পাঠকদের মাথা ধরবে তো নিশ্চিত, মাথা ঘুরতেও পারে, সুতরাং সে চেষ্টা করছি না। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ডাক্তার সেইসব কারণ খুঁজে বের করতে পারবেন, কিন্তু বলার কথা এইটাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাথাঘোরা হলেই তেমন ভয়ানক কিছু ভাবার দরকার নেই, বিশেষ করে সেটা যদি অল্প সময়ের জন্য থাকে, অজ্ঞান হবার ইতিহাস না থাকে, ও নিজে থেকেই কমে যায়। সমস্যা অল্প সময়ের জন্য হলে কষ্ট নিবারণকারী ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। ককলিয়া রোগের উৎস হলে তার জন্য বিশেষ ব্যায়াম ও ওষুধ আছে।

মনে রাখতে হবে, চটজলদি উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ বন্ধ করার আগে, ওই রোগের চিকিৎসা করছেন যে চিকিৎসক, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে। রক্তচাপের ওষুধের কারণে রক্তচাপ কমে গিয়ে কারও ক্ষতি হয়েছে, এমনটা শোনা যায় না। কিন্তু রক্তচাপ কমানোর ওষুধ বন্ধ করে দিলে বা তার ডোজ কমিয়ে দিলে, ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট।

সুতরাং, মাথা ঘুরলে যেন মাথা-খারাপ না হয়ে যায়, যেন বুদ্ধি-বিভ্রাট না ঘটে। চট করে কিছু করে ফেলার তাগিদে নিজের ওপরে একেবারে হাতুড়ে ডাক্তারি প্রয়োগ না করাই বিচক্ষণতার কাজ। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, কার্ডিওলজিস্ট। প্র্যাকটিস করেন।

পেটে ব্যথা

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কিছু পেটে ব্যথা আপনা থেকেই সেরে যায়, কিছু সারে ওষুধ দিয়ে আর কিছুতে অপারেশন ছাড়া গতি নেই। কোন পেটে ব্যথা বিপজ্জনক আর কোনটা ততটা ভয়ের নয়—বুঝবেন কেমন করে? ডাক্তারই হয়তো সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন, কিন্তু কিছুটা আন্দাজ আপনিও করতে পারেন। সব সময়, সব জায়গায় তো ডাক্তার পাবেন না। সামান্য কিছু কথা জেনে রাখুন, তাহলে পেটে ব্যথা বিপজ্জনক কিনা বুঝতে সুবিধা হতে পারে।

হজম না হলে, পেটে গ্যাস হলে, খাওয়া বা মদ খাওয়া বেশি হয়ে গেলে পেটে ব্যথা হয়—কখনো হালকা পেট কামড়ের মতো ব্যথা হয়, সঙ্গে জ্বর বা পাতলা পায়খানা থাকে না। অনেকক্ষেত্রেই আমরা বুঝতে পারি কী থেকে ব্যথা হচ্ছে। কারণটা দূর করলে ব্যথাও সাধারণত কমে যায়। এসব ক্ষেত্রে দু-এক দিন হালকা খাবার খেলে, সঙ্গে কোনো অ্যান্টাসিড বড়ি খেলে কষ্ট কমে যায়।

কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করতে হয় পেটে ব্যথায়—অ্যাপেন্ডিসাইটিস, পেপটিক আলসার ফুটো হয়ে যাওয়া, ডিম্ববাহী নালীতে হওয়া গর্ভ ফেটে যাওয়া, ইত্যাদি। মনে রাখবেন সাধারণত এইসব রোগগুলোর প্রথম অবস্থায় পাতলা পায়খানা, বমি, মাথাব্যথা বা জ্বর থাকে না। যদি হঠাৎ করে হওয়া পেটে ব্যথার সঙ্গে পাতলা পায়খানা, বমি, মাথাব্যথা বা জ্বর থাকে তাহলে পেটে ব্যথার কারণ গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস-এর মতো কোনো রোগ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বাড়িতে কারোর পেটে ব্যথা হচ্ছে। কী দেখবেন?

রোগীকে শুইয়ে তাঁর বুক থেকে জঙ্ঘা অবধি কাপড় সরিয়ে দেওয়া উচিত। এবার পেটটা দেখুন—শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পেট কি স্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করছে?

এবার তাঁকে জোরে নিশ্বাস নিতে ও কাশতে বলুন। জিজ্ঞেস করুন ঠিক কোন জায়গায় ব্যথা হচ্ছে। তীক্ষ্ণ ব্যথায় তিনি আঙুল দিয়ে ব্যথার জায়গাটা দেখাতে পারবেন। বেশি জায়গা জুড়ে ব্যথা হলে তিনি হাতের তালু দিয়ে জায়গাটা দেখাবেন।—এর থেকে একটা আন্দাজ পেতে পারেন ব্যথা কোন প্রত্যঙ্গের রোগের কারণে হচ্ছে।

পেটকে মোট ৯ ভাগে ভাগ করা হয়।

১. পেটের ওপরে ডানদিকে থাকে লিভার, লিভারের নীচে থাকে গলব্লাডার বা পিত্তথলি। আরও পিছনে আছে ডান কিডনি বা বৃক্ক।

২. পেটের ওপরে মাঝখানটায় থাকে পাকস্থলী, বুকের মাঝ-বরাবর গ্রাসনালী এসে পাকস্থলীতে খোলে। পাকস্থলীর নীচে প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়। ওপরেই ডানদিক থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে বৃহদন্ত্র।

৩. পেটের ওপরে বাঁ দিকে থাকে পিলে (spleen), তার পিছনে বাম বৃক্ক।

৪. পেটের মাঝখানটায় অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে ক্ষুদ্রান্ত্র।

৫. পেটের তলায় মাঝখানে সামনে থাকে মূত্রথলি, পিছনে মলাশয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই দুইয়ের মাঝে জরায়ু।

৬. পেটের তলার ডানদিকে ক্ষুদ্রান্ত্র এসে খোলে সিকামে, সিকাম থেকে আঙুলের মতো অ্যাপেন্ডিক্স। মহিলাদের ডান ডিম্ববাহী নালী ও ডান ডিম্বাশয় থাকে পেটের এই অংশে।

৭. তার ঠিক ওপরের ভাগে সিকাম থেকে বৃহদন্ত্র ওপর দিকে ওঠে।

৮. পেটের তলায় বাঁ দিকে থাকে বৃহদন্ত্রের শেষাংশ। মহিলাদের তার সঙ্গে বাঁ ডিম্ববাহী নালী ও বাঁ ডিম্বাশয়।

৯. এর ওপরের ভাগে বৃহদন্ত্র নীচে নামে।

পেটের মধ্যে কিছু নড়াচড়া করছে কিনা সেটা বোঝার চেষ্টা করুন—হাত দিয়ে দেখুন, পেটের ওপর কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করে দেখুন—হয়তো পাইপের মধ্যে দিয়ে জল গেলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা তেমন শব্দ শুনতে পাবেন। খাদ্যনালীর সংকোচন প্রসারণের জন্য এই নড়াচড়া। নড়াচড়ার

সঙ্গে ব্যথা বাড়ছে কিনা, জোরে খলখল আওয়াজ হচ্ছে কিনা দেখুন-শুনুন। পেট কামড়ে ব্যথার সঙ্গে খলখল আওয়াজ হয়তো খাদ্যনালীতে কোনো অবরোধের জন্য। যদি নড়াচড়া করলে ব্যথা বাড়ে, রোগী চুপ করে শুয়ে থাকেন, পেট শক্ত হয়ে থাকে, পেটে কোনো আওয়াজ শোনা না যায়, তাহলে হয়তো অ্যাপেন্ডিক্স পচে ফুটে হয়ে গেছে বা পেপটিক আলসার ফুটো হয়ে গেছে। সেসব কিন্তু খুব ইমার্জেন্সি ব্যাপার।

কুঁচকিতে ফোলা আছে কিনা দেখুন। ইংগুইনাল হার্নিয়া আটকে গিয়ে পেটে ব্যথা হতে পারে। এই হার্নিয়া পুরুষদের বেশি দেখা যায়, মহিলাদেরও হতে পারে। পেট টিপে দেখতে পারেন। আঙুল সোজা রেখে হাতের তালু দিয়ে টিপতে হয়। প্রথমে যেখানে ব্যথা নেই সেখানে টেপা শুরু করে ব্যথার জায়গায় যেতে হয়। ব্যথার মূল জায়গা ধরতে পারলে হয়তো বুঝবেন কোন অঙ্গ থেকে ব্যথা হবার সম্ভাবনা। যেমন পেটের ওপরে ডানদিকে ব্যথা হলে গলব্লাডার (পিত্তথলি)-এর ব্যথা হবার খুব সম্ভাবনা।

এবার পেটে ব্যথার কারণ রোগগুলো সম্বন্ধে কিছুটা জেনে নেওয়া যাক

- **খাদ্যনালী কামড়ানো ব্যথা**

  সমস্ত পেটে বা নাভির চারদিকে ও নীচের দিকে ব্যথা, হঠাৎ কামড়ে ব্যথা হয়, আবার চলে যায়। বমি হয় না। কখনো পরের দিকে পাতলা পায়খানা হলেও হতে পারে। রোগীকে অসুস্থ দেখায় না, হেঁটেচলে তিনি বেড়াতে পারেন। তাপমাত্রা, নাড়ীর গতি স্বাভাবিক থাকে। পেটে কোথাও টিপলে ব্যথা লাগে না, বরং আরাম লাগে।

- **হঠাৎ করে হওয়া বদহজম**

  ওপরের পেটে বাঁদিকের পাঁজরের নীচে লাগাতার জ্বালার মতো ব্যথা। বারবার বমি হতে থাকে। প্রথমে পাতলা পায়খানা হয় না, ২৪-৪৮ ঘণ্টা পর থেকে হতে পারে। বমিভাব, বমি ও দুর্বলতা থাকে, তবে রোগী সেরে উঠতে থাকেন। তাপমাত্রা সাধারণত স্বাভাবিক থাকে, কখনো-সখনো ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবধি উঠতে পারে। নাড়ীর গতি একটু বেশি থাকে, মিনিটে ৮০-৯০। কখনো-সখনো পেটে টিপলে ব্যথা লাগে, তবে খুব বেশি নয় আর উপরের পেটে।

- **কিডনিতে পাথরের কারণে ব্যথা**

  তীব্র কামড়ানো ব্যথা পিঠের একপাশ থেকে সেদিকের কুঁচকিতে নামে, পুরুষদের ক্ষেত্রে সেদিকের অণ্ডকোষে। কামড়ানো ব্যথা হওয়ার সময় বমি হতে পারে, পাতলা পায়খানা থাকে না। ব্যথার সময় রোগী খুব কষ্ট পান। তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের কম থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। পিঠে পাঁজরের নীচে টিপলে ব্যথা লাগে, যেদিকের কিডনিতে পাথর আছে। এ ধরনের ব্যথায় কামড়ানো ব্যথা কমানোর ওষুধ হায়োসিন বুটাইল ব্রোমাইড (Buscopan পরিচিত ব্র্যান্ড) বা ডাইসাইক্লোমিন (Decolic পরিচিত ব্র্যান্ড) ব্যথা কমায়। ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়। ছোটো পাথর অনেক সময় মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে আবার অপারেশনও লাগে।

- **পিত্তথলিতে পাথরের জন্য ব্যথা**

  ডানদিকে ওপরের পেট থেকে তীব্র কামড়ানো ব্যথা পিঠের দিকে বা ডান কাঁধের দিকে যায়। ব্যথার সময় বমি হতে পারে, পাতলা পায়খানা হয় না। ব্যথার সময় রোগী খুব কষ্ট পেতে থাকেন। তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের কম থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। ডানদিকের পাঁজরের নীচে টিপলে ব্যথা লাগে। এ ধরনের ব্যথাতেও কামড়ানো ব্যথা কমানোর ওষুধ হায়োসিন বুটাইল ব্রোমাইড বা ডাইসাইক্লোমিন ব্যথা কমায়। তেল-চর্বি, দুধ খাবেন না। অপারেশন করাতেই হবে, তবে সেটা তৎক্ষণাৎ করা হয় না। সাধারণত তীব্র ব্যথা হওয়ার ৪-৬ সপ্তাহ পর অপারেশন করা হয়।

- **অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা**

  নাভির ওপরে ব্যথা শুরু হয়ে ডানদিকের তলপেটে এসে স্থির হয়, সবসময় ব্যথা থাকে, খুব তীব্র ব্যথা না-ও হতে পারে। শুরুতে এক-দু-বার বমি হতে পারে। পাতলা পায়খানা বা কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে। রোগী অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকেন। তাপমাত্রা শুরুতে স্বাভাবিক থাকে, পরে বাড়ে। নাড়ীর গতি বেশি থাকে। ডানদিকের তলপেটে টিপলে ব্যথা লাগে। এই ব্যথা ওঠার পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন করিয়ে নেওয়া উচিত, না হলে অ্যাপেন্ডিক্স ফুটো হয়ে জীবনসংশয় হতে পারে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন না করানো গেলে সপ্তাহ ছয়েক বাদে অপারেশন করিয়ে নেওয়া উচিত। এই রকম ব্যথা উঠলে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাওয়া উচিত।

- **পেরিটোনাইটিস**

  পেটের সর্বত্র লাগাতার তীব্র ব্যথা। বমি হতে থাকে,বমি সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে, পাতলা পায়খানা হয় না। রোগীকে খুব অসুস্থ দেখায়, নড়াচড়া করলে ব্যথা বাড়ে। তাপমাত্রা ৩৯.৫ ডিগ্রি বা তার বেশি হয়, মৃত্যুর আগে অবশ্য তাপমাত্রা কমে যায়। নাড়ীর গতি মিনিটে ১১০-এর বেশি থাকে। পেটের সর্বত্র টিপলে খুব ব্যথা হয়, পেটটা টানটান হয়ে থাকে। এই রোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করা ছাড়া উপায় নেই।

- **অন্ত্রে অবরোধ বা intestinal obstruction**

  প্রথমে কামড়ানো ব্যথা, পরে লাগাতার ব্যথা হতে থাকে। বমি সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে, পায়খানা হয় না। রোগী খুব অসুস্থ থাকেন। তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে, নাড়ীর গতি বাড়তে থাকে। পেটের সর্বত্র টিপলে অল্প ব্যথা হয়, পেট শক্ত হয়ে থাকে না, ফুলে থাকে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করাতে হয়, অপারেশন লাগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

- **হার্নিয়া আটকে যাওয়া**

  কুঁচকিতে লাগাতার তীব্র ব্যথা। প্রথমে বমি থাকে না, পরে আন্ত্রিক অবরোধের জন্য হতে থাকে। পায়খানা হয় না। রোগী খুব অসুস্থ থাকেন। তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে, নাড়ীর গতি বাড়তে থাকে। কুঁচকিতে ফোলার ওপর টিপলে ব্যথা লাগে। অপারেশন না করালে জীবন-সংশয়।

- **পেপটিক আলসার ফুটো হয়ে যাওয়া**

বমি কমই হয়, পাতলা পায়খানা হয় না। প্রথমে তীব্র শক হয়, তারপরও রোগী অসুস্থ থাকেন। তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকে। প্রথমে নাড়ীর গতি স্বাভাবিক থাকে, কয়েক ঘণ্টা পর বাড়তে থাকে। পেটের সর্বত্র টিপলে ব্যথা হয়, সবচেয়ে বেশি পেপটিক আলসারের ওপর। পেট শক্ত হয়ে থাকে। এই রোগে অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

- **সিস্টাইটিস বা মূত্রথলির জীবাণুসংক্রমণ**

মেয়েদেরই হয় বেশি, ছেলেদেরও হতে পারে। তলপেটে সবসময় ব্যথা, পেচ্ছাপ করার সময় জ্বলে যায়। বমি বা পাতলা পায়খানা হয় না। সংক্রমণ বেশি হলে জ্বর হতে পারে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক বা একটু বেশি থাকে। তলপেটে টিপলে মোটামুটি ব্যথা হয়। ডাক্তার দেখিয়ে মূত্রের সাধারণ ও কালচার-সেন্সিটিভিটি পরীক্ষা করে জীবাণুনাশক ব্যবহার করাই ভালো।

মহিলাদের আরও কিছু পেট ব্যথার কারণ

- **স্যালপিঞ্জাইটিস বা ডিম্ববাহী নালীর প্রদাহ**

তলপেটের একদিকে বা দুই দিকে ব্যথা। কখনো-সখনো ব্যথার শুরুতে বমি হতে পারে। সাধারণত পাতলা পায়খানা হয় না। রোগিণী অসুস্থ থাকেন, যোনিপথ দিয়ে রক্তস্রাব বা সাদাস্রাব হতে পারে। জ্বর থাকে, নাড়ীর গতি বেশি থাকে। তলপেটের একদিকে বা দুই দিকে টিপলে ব্যথা হয়। স্ত্রীরোগবিদ দেখিয়ে নেওয়া উচিত। ডাক্তার জীবাণুনাশক (যেমন সিপ্রোফ্লক্সাসিন)-এর সঙ্গে মেট্রোনিডাজোল বা টিনিডাজল দেন, সঙ্গে ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন।

- **রাপচারড এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি বা ডিম্ববাহী নালীতে গর্ভ ফেটে যাওয়া**

অল্প কিছু দিন মাসিক বন্ধ আছে এমন মহিলার হঠাৎ তলপেটে তীব্র ব্যথা। ব্যথার শুরুতে বমি হতে পারে। পাতলা পায়খানা হয় না। রোগিণী খুব অসুস্থ থাকেন, পেটে বেশি রক্তপাত হলে শকে চলে যেতে পারেন। কারোর কারোর যোনিপথ দিয়ে রক্তক্ষরণও হতে পারে। তাপমাত্রা শুরুতে স্বাভাবিক থাকে, পরে একটু বাড়তে পারে, শক হলে কমে যেতে পারে। নাড়ীর গতি বেশি থাকে, রক্তপাত হয়ে যেতে থাকলে বাড়তে থাকে। তলপেটে টিপলে ব্যথা লাগে। জরুরি অপারেশন করে রক্তপাত বন্ধ না করলে জীবন-সংশয়।

- **গর্ভপাত**

মাসিক কিছুদিন বন্ধ থাকার পর প্রসবযন্ত্রণার মতো কামড়ানো ব্যথা হয়। বমি বা পাতলা পায়খানা হয় না। রোগিণী উদ্বিগ্ন থাকেন। যোনিপথে রক্তক্ষরণ বেশি হলে নেতিয়ে পড়েন। তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক বা একটু বেশি থাকতে পারে। যোনিপথে রক্তক্ষরণ বেশি হলে নাড়ীর গতি বাড়তে থাকে। তলপেটে টিপলে ব্যথা হয়। ডাক্তার দেখানো উচিত। জরায়ুতে ভ্রূণ বা গর্ভফুলে কিছুটা থেকে গেলে পরিষ্কার করতে হয়, না হলে রক্ত বন্ধ হয় না।

আশা করি, পেটে ব্যথা সম্বন্ধে কিছুটা জানলেন এবার। কী হলে কী করবেন মনে থাকবে তো? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় একটি শ্রমজীবী মানুষের জন্য ক্লিনিকের সর্বক্ষণের চিকিৎসক।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

টুকরো খবর

রোগ নির্ণয়ে ৩ডি প্রিন্টেড ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ’

চিত্র ১. ব্যাঙাচি চলে তার লেজের নড়াচড়ার দৌলতে।

পেটের মধ্যে এন্ডোস্কোপ নামক যন্ত্রটা ঢুকিয়ে দিয়ে নানা কিছু দেখতে পান ডাক্তাররা, আর ‘পেটের খবর’ টেনে বের করে আনতে পারলে নানা রোগ ধরা পড়ে তাড়াতাড়ি। যেমন মুখের মধ্যে দিয়ে এন্ডোস্কোপ ঢুকিয়ে পাকস্থলীর ঘা ধরা যায়, বা পায়ুদ্বারের মধ্যে দিয়ে এন্ডোস্কোপ ঢুকিয়ে দিয়ে ধরা পড়তে পারে বৃহদন্ত্রের ক্যানসার। কিন্তু এই এন্ডোস্কোপ নামক যন্ত্রটি বেশ বড়ো, তার আবার লেজের মতো নল থাকে, তাই রোগীর পক্ষে সেটা দেহস্থ করা বিস্তর ঝামেলা। তাঁর অস্বস্তি ও কষ্ট নেহাত কম নয়। কেমন হত যদি একটা ছোট্ট বড়ির মতো জিনিস টুক করে গিলে ফেলতেন রোগী, আর সেই বড়িটাই পেটের মধ্যে গিয়ে ছবি তুলে পাঠাত? ওই এন্ডোস্কোপের মতোই? আর বাইরে থেকে চিকিৎসক সেই বড়িটাকে ইচ্ছেমতো এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে ছবি তুলতে পারতেন, তারপর সেই বড়িটা আবার সাঁতরে বেরিয়ে আসত পেট থেকে?

‘‘কেমন হত’’ বলে হা-হুতাশ করার দরকার বেশিদিন নেই। সেই প্রযুক্তি এখন প্রায় এসে গেছে। অবশ্য ‘বড়ি’ না বলে তাকে ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ’ নামে ডাকা হচ্ছে, কেননা জলের মধ্যে ব্যাঙাচি যেমন করে চলে, এই ছোট্ট রোবোটিক এন্ডোস্কোপের চলার কায়দাটা সেইরকম। রোগী এই মাইক্রোরোবট ‘ব্যাঙাচি’টি টুপ করে গিলে খান, আর সেটি চলে যায় রোগীর দেহের মধ্যে। তারপর রোবট-নিয়ন্ত্রক কনসোলে বসে চিকিৎসক ‘ব্যাঙাচি’-র ক্যামেরা অন করে দেন, দূর-নিয়ন্ত্রণে (রিমোট কন্ট্রোল) সেটিকে দেহের মধ্যে নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছবি তোলেন আর মনিটরে সেই ছবি দেখেন। কাজ শেষ হলে ‘ব্যাঙাচি’-র ওপর হুকুম জারি করেন দেহ ছাড়তে, তখন সে মুখ দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। রোগীর কষ্ট হয় না একেবারেই। প্রসঙ্গত, এই ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ’টি তৈরি হয়েছে যে প্রযুক্তিতে তার নাম ৩টি প্রিন্টিং। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* (অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়) আপনারা এই প্রযুক্তিতে তৈরি ‘টেবিলের ওপর রাখার মতো মস্তিষ্ক কলা’’ নিয়ে পড়েছেন।

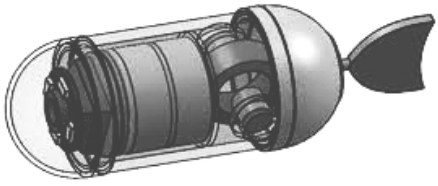

চিত্র ২. ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ’-এর ভেতরকার গঠনের নকশা। লেজটি ছোটো হলেও ব্যাঙাচির লেজের মূলনীতি মেনেই তা এই রোবোটিক এন্ডোস্কোপকে এদিক সেদিক নিয়ে যায়।

চিত্র ৩. মানুষের পাকস্থলীর মধ্যে ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ’কে যতটুকু দেখাবে।

এদেশের খবরের কাগজে এটুকু খবরই আছে, আর আমরা *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-র খবর অনুসারে এই পর্যন্ত লিখলাম। এন্ডোস্কোপি করাবেন বলে স্থির করেছেন কিন্তু সাহস পাচ্ছেন না, এমন কোনো রোগীর এটুকু পড়ে মনে হতেই পারে, দু-দিন পিছিয়েই দিই না হয় এন্ডোস্কোপি, একেবারে বিনা যন্ত্রণায় ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপি’-ই করিয়ে নেব। এঁদের জন্য একটু হুঁশিয়ারি আছে।

এখনও পর্যন্ত মানুষের দেহে এই ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ’টি ব্যবহার করা হয়নি। হংকং-এর চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মডেলটি তৈরি হয়েছে, কৃত্রিম পাকস্থলী ও শূকরের পাকস্থলীতে বিভিন্ন দিকে সেটার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এর মূল কাজ, ক্যামেরা দিয়ে দেহের ভেতরের ফোটো তোলা, তাও আবার দূর-নিয়ন্ত্রণে, সেটার ট্রায়াল হয়নি। তার আগেই খবরের কাগজে এটা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে দেখলে মনে হবে আজ বাদে কাল এটা মেডিক্যাল কলেজে না হোক বাইপাসের ধারের কোনো হাসপাতালে করাই যাবে। তা কিন্তু নয়। এটা খুব সম্ভব একদিন মানুষের কাজে লাগবে, কিন্তু সেটা আরও অনেক ধাপ পরীক্ষানিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে। আমাদের দেশে খবরের কাগজ পড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধুনাতম উন্নতির হাল-হকিকৎ বুঝতে গেলে খুব সতর্ক থাকতে হবে, নইলে ভুলের ফাঁদে পড়তে পারেন।

সব শেষে, কার্যকর মডেল তৈরি হলে ‘ব্যাঙাচি এন্ডোস্কোপ’ জিনিসটা বেশ মজার, সেটা বলতেই হয়। কিন্তু খালি মজার কথা, তাই বা বলি কেমন করে? কেননা, এ যন্ত্র মূলত ব্যবহৃত হয় ক্যানসার ধরতে, সেটা তো আর মজার জিনিস নয়। আর এদেশে সেটা যদি আসে তবে খরচা পড়বে দেদার, সেও ভারী চিন্তার বিষয়।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ও http://www.3ders.org/articles/20150915-3d-printed-tadpole-endoscope-device-can-improve-cancer-diagnoses.html এবং http://www.firstwordmedtech.com/node/979628?tsid=28&region id=4

টুকরো খবর

এফডিএ প্রথম ৩ডি প্রিন্টেড ওষুধকে স্বীকৃতি দিল

মৃগীরোগীদের কয়েক ধরনের খিঁচুনির চিকিৎসার জন্য এক ৩ডি প্রিন্টেড ওষুধকে স্বীকৃতি দিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ নিয়ামক সংস্থা এফডিএ। লেভেটিরাসিটাম মুখে-খাবার খিঁচুনি-চিকিৎসার ওষুধ। বাচ্চা ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃগীরোগজনিত আংশিক ও মায়োক্লোনিক খিঁচুনি এবং সারাদেহের টোনি-ক্লোনিক প্রাথমিক খিঁচুনিতে এটা কার্যকর। এপ্রেসিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস নতুন প্রযুক্তিতে এই পুরোনো ওষুধটি তৈরি করেছে। তারা জানিয়েছে যে ৩-ডি প্রিন্টিং-এর সাহায্যে একটা সছিদ্র (porous) ফর্মুলেশন তৈরি করা গেছে যা একটুখানি জল দিলেই গুলে যাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩-ডি প্রিন্ট করে ট্যাবলেট করলে তা একজন নির্দিষ্ট রোগীর সুনির্দিষ্ট দরকার অনুসারে ফর্মুলেশন (যেমন ট্যাবলেট) দেওয়া যাবে, সেটা দরকারমতো একটুখানি জল দিয়ে গুলে নিয়ে খাওয়া যাবে। এতে সবথেকে সুবিধা বাচ্চাদের ও বৃদ্ধদের কেননা বড়ো ট্যাবলেট (যেমন ১০০০ মিলিগ্রাম) খেতে তাঁরা অসুবিধা বোধ করেন।

৩-ডি প্রিন্টে দ্রব্যটি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। সাধারণ ৩ডি প্রিন্টারে পলিমার নিয়ে 'প্রিন্ট' করা হয়, আর ওষুধের ৩ডি প্রিন্টের জন্য পলিমারের বদলে ওই ওষুধটাই লাগে। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি তৈরিতে এই পদ্ধতি আগেও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) লেভেটিরাসিটাম-কেই প্রথম ৩ডি ওষুধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে—ওষুধ কোম্পানির এমনটাই দাবি।

''মৃগীরোগের জন্য খুব ব্যবহৃত এই ওষুধের জন্য ৩ডি প্রিন্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করে 'স্পিরাটাম' [লেভেটিরাসিটাম-এর ট্রেডনাম] যেসব রোগী তাঁদের ওষুধ খাওয়া নিয়ে বর্তমানে সমস্যায় পড়ছেন, তাঁদের প্রয়োজন মেটাল''—বলেছেন আপরেসিয়া কোম্পানির প্রধান এক্সিকিউটিভ অফিসার ডন ওয়েদারহোল্ড। আপরেসিয়া কোম্পানি এই প্রযুক্তির নাম দিয়েছে জিপডোজ (ZipDose), যাতে একটা ডোজে ১০০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ওষুধ দেওয়া যাবে।

আপরেসিয়া কোম্পানি বলছে, ''এর ফলে স্পিরাটাম রোগীর [ওষুধ-সংক্রান্ত] অভিজ্ঞতা ভালো হবে, একটু জল দিয়েই এতখানি ডোজ একবারে খেয়ে নেওয়া যাবে। আর প্রত্যেক ডোজ একজন রোগীর দরকারমতো কম বা বেশি করা যাবে। এতে ওষুধ নিয়ে ভ্রমণ করতেও সুবিধা হবে।'' অর্থাৎ ঠিকঠাক ডোজ পাবার জন্য ট্যাবলেট ভাঙারও দরকার হবে না, আর চট করে একটু জলে গুলে একটা আস্ত বড়ো ট্যাবলেটও কোনো অসুবিধা ছাড়াই খাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যেসব ওষুধ আপরেসিয়া কোম্পানি বাজারজাত করতে চেলেছে, 'স্পিরাটাম' তথা লেভেটিরাসিটাম হল তাদের মধ্যে প্রথম। ২০১৬ সালে 'স্পিরাটাম' পাওয়া যাবে, আর কোম্পানির দাবি হল, তা রোগীর ওষুধ গ্রহণ করার ধরনের মধ্যে 'স্পিরাটাম' বদল আনবে।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* (http://www.pressreader.com/india/the-times-of-india-new-delhi-edition/20150806/282321088722262/TextView)

সম্পাদকীয় সংযোজন

টাইমস অফ ইন্ডিয়া ও নানা সংবাদপত্রে বিজ্ঞানের খবর থাকে, তার মধ্যে চিকিৎসা ও ওষুধের খবরও থাকে। এটা হল সেরকম খবরের নমুনা। স্পষ্টতই, সাংবাদিক ওষুধটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না, ৩ডি প্রযুক্তি নিয়েও তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ওষুধ কোম্পানির বড়ো এক্সিকিউটিভদের কথাগুলো উগরে দেওয়া হয়েছে এই খবরে। তবু, ৩ডি প্রযুক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে, এই কথা মনে রেখেই আমরা পাঠকদের কাছে খবরটা রাখলাম। কিন্তু আর কয়েকটা কথা না বললে পাঠক বিভ্রান্ত হবেন।

লেভেটিরাসিটাম কোনো নতুন ওষুধ নয়। ইউসিবি ফার্মাসিউটিক্যালস 'কেপ্রা' (Keppra) নামে এটা বহুদিন তৈরি করছে, আর ২০০৮ সালে এটা আমেরিকা ও ব্রিটেনে জেনেরিক নামেও তৈরি হচ্ছে। একই ওষুধ, কিন্তু তার মধ্যে 'উল্লেখযোগ্য' পরিবর্তন ঘটিয়ে সেটাকে পেটেন্টের আওতায় আনা যায় ও দাম প্রায় ইচ্ছেমতো বাড়ানো যায়; ওষুধশিল্পে এই কু-কায়দাটা খুব পরিচিত। এই কায়দাটার নাম হল এভারগ্রিনিং (evergreening)। আপরেসিয়া কোম্পানি লেভেটিরাসিটাম-কে ৩ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে তৈরি করে 'স্পিরাটাম' নামে নতুন পেটেন্ট পেতে চাইছে, আর তার জন্য প্রচারকার্যের একটা অংশ হল এইরকম 'বৈজ্ঞানিক খবর' তৈরি করে জনমনে এমন ধারণা তৈরি করা যে এটা যেন নতুন ধরনের ওষুধ। এরপর

বিজ্ঞাপনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার অংশীদার হব না। কাগজে চালু হাজার খবরের অল্প কিছু খবরই সত্যিকারের মূল্যবান, এবং তার মধ্যেও ভেজাল কম নয়। তাই খবরের সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিক সমালোচনাও যথাসম্ভব দিতে হবে, যাতে পাঠক অতিরঞ্জিত দাবি পড়ে ঠকে না যান।

ওষুধ-নিয়ামক সংস্থার ওপর প্রভাব খাটানো, ডাক্তারদের মগজধোলাই ইত্যাদি তো আছেই। এটা নতুন ওষুধ নয়, এই ওষুধে অতিরিক্ত লাভ সামান্যই, যদিও কোম্পানির লাভ (যদি নতুন ওষুধের মতোই পেটেন্ট অধিকার তারা পায়) প্রভূত।

আমরা বলছি না যে ৩ডি প্রযুক্তি কোনো কাজের নয়। ৩ডি প্রযুক্তি নানা কাজে লাগতে পারে, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে, সেটা আমরা আগেই বলেছি। লেভেটিরাসিটাম-কে ৩ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে তৈরি করে রোগীর কিছু লাভ হচ্ছে সেটাও অনস্বীকার্য। তা বলে সেটা নতুন ওষুধ নয়, ব্যাবসায়িক দিক থেকে নতুন ওষুধকে যে সুবিধা

দেওয়া হয়, তার যোগ্য দাবিদারও নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে হয়তো আপরেসিয়া কোম্পানি সেভাবেই ব্যাবসায়িক সুবিধা তুলতে চাইছে।

আর একটা ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* দৈনিক সংবাদপত্রে এই খবরটা আছে, অন্য অনেক সংবাদপত্রেও আছে, এবং তা আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে। ইন্টারনেটে অনেকগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক খবরের কাগজ (ওয়েবজিন) ও ব্লগ-এ এই খবরের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি জায়গায় এই খবরের বয়ান প্রায় এক। মনে হচ্ছে, সমস্ত জায়গার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিকরা একই সোর্স থেকে খবরটি সংগ্রহ করেছেন, এবং যেকোনো কারণেই হোক খবরটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ যাচাই করে দেখা হয়নি। দেখা উচিত ছিল, কেননা আপরেসিয়া কোম্পানির সিইও তাঁদের একটা 'প্রোডাক্ট' সম্পর্কে যেটা বলবেন বিজ্ঞানের দিক থেকে সেটা অতিরঞ্জিত হতে পারে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে বাংলা ও ইংরাজিতে নানা পত্রিকা রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন খবরের কাগজে চিকিৎসা সংক্রান্ত পাতা, তাতে অজস্র খবর থাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সম্পর্কে। আমাদের কাছে বারংবার অনুরোধ এসেছে, আমরা যেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের নবদিগন্ত এনেছে এমন ওষুধ ও প্রযুক্তি নিয়ে লেখা প্রকাশ করি। আমরাও সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারে এমন ওষুধ-প্রযুক্তি নিয়ে লেখা প্রকাশে আগ্রহী, কিন্তু নতুন অবদানগুলো সত্যি কতটা কাজের সেটা বোঝা অত সহজ নয়। তাই আমরা এইসব খবর দেব, কিন্তু বিজ্ঞাপনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার অংশীদার হব না। কাগজে চালু হাজার খবরের অল্প কিছু খবরই সত্যিকারের মূল্যবান, এবং তার মধ্যেও ভেজাল কম নয়। তাই খবরের সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিক সমালোচনাও যথাসম্ভব দিতে হবে, যাতে পাঠক অতিরঞ্জিত দাবি পড়ে ঠকে না যান।

Advt

Wth Best Compliments from

A
Well Wisher

টুকরো খবর

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে ভারত পৃথিবীতে এক নম্বরে

চিত্র ১. ভারতে যেকোনো ওষুধ বিনা প্রেসক্রিপশনে মেলে, অ্যান্টিবায়োটিকও।

চীনের জনসংখ্যা এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের চাইতে কিছু বেশি, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক খাবার বিচারে ভারত চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয়রা গত একবছরে ১৩ বিলিয়ন অ্যান্টিবায়োটিক বড়ি বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার করেছেন, আর চীনে ওই পরিমাণটা হল ১০ বিলিয়ন। ১৩ বিলিয়ন মানে হল ১৩০০ কোটি, আর খেয়াল রাখবেন ভারতের জনসংখ্যা হল ১৩০ কোটির বেশ খানিকটা নীচে, আর চীনের জনসংখ্যা ১৩২ কোটি ছুঁইছুঁই। আমেরিকানরা অবশ্য তাদের কম জনসংখ্যা সত্ত্বেও তেমন পিছিয়ে নেই, সেখানে গত বছর ৭ বিলিয়ন অ্যান্টিবায়োটিক বড়ি বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার হয়েছে। মাথাপিছু অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের হার অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি—বছরে ২২টি অ্যান্টিবায়োটিক বড়ি (বা ইঞ্জেকশন), আর ভারতে সেই সংখ্যা মাথাপিছু ১১টি, চীনে মাথাপিছু ৭টি। তবে আমাদের দেশে সব মানুষের উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার (অ) সম্ভাবনা ও ডাক্তার না-দেখিয়ে ওষুধ খাবার সংস্কৃতি—এ দুটো খতিয়ে দেখলে বলতেই হয় যে এদেশে আমেরিকার চাইতে অ্যান্টিবায়োটিক অপব্যবহারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই অপব্যবহারের ফল হল অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণুর আবির্ভাব ও দ্রুত বিস্তার, যেটা ভারতে খুব বেশিই হয়েছে।

ওয়াশিংটন-কেন্দ্রিক সংগঠন Centre for Disease Dynamics, Economics and Policy (সংক্ষেপে সিডিডিইপি) তার প্রথম 'বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক' রিপোর্টে বলছে, কার্বাপেনাম গোত্রের ওষুধ, যা ছিল অ্যান্টিবায়োটিক-ভাণ্ডারে বহুক্ষেত্রে শেষ অস্ত্র, তাতে ক্লেবসিয়েলা নিউমোনি জীবাণু ভারতে বিশেষ মরছে না; ২০১৩ সালে যেখানে ক্লেবসিয়েলা নিউমোনি-র মধ্যে কার্বাপেনাম-প্রতিরোধী ছিল শতকরা ২৯ ভাগ, ২০১৪ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৭ ভাগ। অন্যদিকে ইউরোপে এই জীবাণুর মধ্যে কার্বাপেনাম-প্রতিরোধী হবার হার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। আমাদের দেশে হাসপাতাল থেকে আসা সংক্রমণে কার্বাপেনাম-প্রতিরোধী এই জীবাণু খুব বেশি দেখা যায়।

ক্লেবসিয়েলা-র এই প্রজাতির জীবাণু নিয়ে উদ্বেগের বিশেষ কারণ আছে। এদের শতকরা ৮০ ভাগ তৃতীয় জেনারেশন সেফালোস্পোরিন, শতকরা ৭৩ ভাগ ফ্লুরোকুইনোলোন গোত্রের সব অ্যান্টিবায়োটিক, ও শতকরা ৬৩ ভাগ অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড গোত্রের সব অ্যান্টিবায়োটিকে প্রতিরোধী। সোজা কথায়, আমরা এই জীবাণুর সামনে অসহায়।

অথচ আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের ওপর অন্ধ নির্ভরতা বাড়ছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল সময়পর্বে ভারতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বেড়েছে শতকরা ৪৩ ভাগ। তাই কেবল ক্লেবসিয়েলা নয়, অন্য জীবাণুও ক্রমাগত অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। এদেশে নানাধরনের সংক্রমণের এক খুব সাধারণ কারণ হল ই.কোলি নামক জীবাণু, সেটারও এক বিরাট অংশ তিন-তিনটে অ্যান্টিবায়োটিক গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। ই. কোলি নিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে এখন ভারী দুশ্চিন্তা। ভারতে শতকরা ১৩ ভাগ ই. কোলি জীবাণু কার্বাপেনাম গোত্রের অ্যান্টিবায়োটিকেও প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া পুঁজ হয় এমন সব সংক্রমণের এক প্রধান জীবাণু হল স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, তাদের কেউ কেউ বহু-অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী, এদের সংক্ষেপে বলা হয়

ক্লেবসিয়েলা-র এই প্রজাতির জীবাণুর সামনে আমরা অসহায়

'এমআরএসএ' (Multi-Resistant Staphylococcus Aureus, বা MRSA)। ভারতে ২০০৯ সালে সব স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস সংক্রমণের মধ্যে 'এমআরএসএ'-এর অংশ ছিল শতকরা ২৯ ভাগ; ২০১৪ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৭ ভাগ। কার্যক্ষেত্রে এর ফল খুব ভয়াবহ। যেমন, সদ্যোজাত-র সংক্রমণ এদেশে খুব বেশি, আর এখন এই সংক্রমণে শিশুরা প্রায় অসহায়ভাবে মারা পড়ছে।

সিডিডিইপি-র ডাইরেক্টর রামানন লক্ষ্মীনারায়ণ এই 'বিশ্ব অ্যান্টি-বায়োটিক' রিপোর্টের একজন লেখক। তিনি বলছেন, ''অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক বড়ো বিপদ, বিশেষ করে যেসব দেশে [যথা ভারত] প্রেসক্রিপশনের ওপর নিয়মিত নজরদারির কোনো ব্যবস্থা নেই।''

নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার এই সমস্যার যথার্থ উত্তর নয়, কেননা নতুন অ্যান্টিবায়োটিক পুরোনোগুলোর চাইতে বেশি দামি হবে। তাই নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হলেও গরিব দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষ মরতে থাকবেন। সিডিডিইপি-র ডাইরেক্টর লক্ষ্মীনারায়ণের ভাষায়, ''অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী সংক্রমণের ক্ষেত্রে বলা যায়, এর মূল্য বড়োলোকেরা দেবেন তাঁদের পকেট খালি করে, আর গরিবরা দেবেন নিজেদের জীবন দিয়ে।''

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ (http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/At-13-billion-pills-in-a-year-India-tops-in-antibiotics-use-globally/articleshow/48998137.cms)

http://www.cddep.org/sites/default/files/india-report-web_8.pdf

http://www.asiantribune.com/node/87910

টুকরো খবর

মানুষের চেয়ে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক পায় পশুপাখি

খামারের মুরগি আর গোরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি পশুদের ওপর অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা ভারত এবং সারা বিশ্ব জুড়েই এক বড়ো সমস্যা। ২০১০ সালে ৬৩,০০০ টন অ্যান্টিবায়োটিক এইভাবে পশুপাখির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা মানুষের ওপর প্রযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের চাইতে বেশি।

ভারতে এর মধ্যেই এই অবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলো টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে মুরগির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক-জাতীয় ওষুধ সালফাডায়াজিন-এর কার্যকারিতা এখন শূন্য, কেননা মুরগিকে আক্রমণ করে এমন সমস্ত জীবাণু এখন সালফাডায়াজিন-

আমরা দ্রুত 'অ্যান্টিবায়োটিক-উত্তর' যুগের দিকে এগিয়ে চলছি, যখন যেকোনো অতি সাধারণ জীবাণুঘটিত রোগেরও কোনো ওষুধ থাকবে না।

প্রতিরোধী। এইসব জীবাণুর মধ্যে স্ট্যাফাইলোকক্কাস গোত্রের জীবাণুও আছে, যারা মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে। মুরগির সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শ বা মুরগির ডিম ও মাংস থেকে এই সব সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আমরা দ্রুত 'অ্যান্টিবায়োটিক-উত্তর'

যুগের দিকে এগিয়ে চলছি, যখন যেকোনো অতি সাধারণ জীবাণুঘটিত রোগেরও কোনো ওষুধ থাকবে না। আবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিকগুলি অতি-ব্যবহার ও অপব্যবহার তাদের অকেজো করে দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ও
http://jac.oxfordjournals.org/content/53/1/28.full ও
http://jac.oxfordjournals.org/content/53/1/28.full

Advt

With Best compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

টুকরো খবর

দ্রুত ছড়াচ্ছে ‘সুপারবাগ’

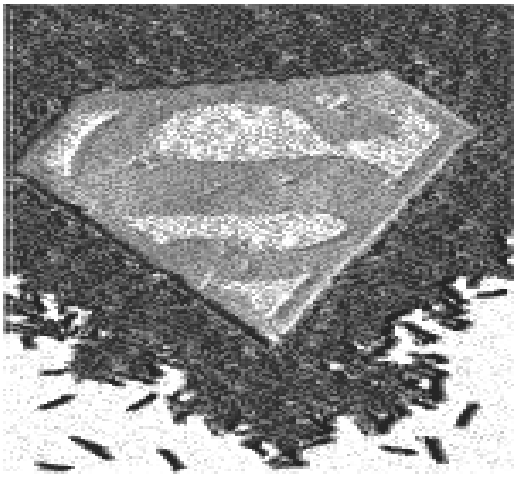

সুপারম্যান নিয়ে আমাদের হইচই আর আদিখ্যেতার শেষ নেই, কিন্তু দিল্লি থেকে আগত যে ‘সুপারবাগ’ বিশ্বজয় করে চলছে তার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। সম্প্রতি প্রকাশিত Centre for Disease Dynamics, Economics and Policy., সংক্ষেপে সিডিডিইপি, এর রিপোর্টে জানা গেছে ‘সুপারবাগ’ আখ্যায়িত এই জীবাণু ৭০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু জীবাণুর শরীরে একটি এনজাইম বা উৎসেচক পাওয়া গেছে, সেই এনজাইমটির নাম হল ‘নিউ ডেলহি মেটালো-বিটা-ল্যাকটামেজ-১’। এই উৎসেচক শরীরে থাকলে সেই জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে যায়, বিশেষ করে নতুন শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক কার্বাপেনেম-গোত্রের ওষুধ সে জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে না; তাই তাকে বলা হয় ‘সুপারবাগ’, বা মহা শক্তিশালী জীবাণু। একজন সুইডিশ নাগরিকের শরীরে ২০০৯ সালে এই উৎসেচকটি প্রথম খুঁজে পাওয়া যায়। যে বিজ্ঞানীরা এটি খুঁজে পান, তাঁরা নিশ্চিতভাবে মনে করেছিলেন যে সুইডিশ নাগরিকটি যখন ভারতে দিল্লিতে ‘ক্লেবসিয়েলা নিউমোনি’ জীবাণুদ্বারা সংক্রমণগ্রস্ত হন, তখনই তাঁর শরীরে ওই জীবাণু এসেছিল। তাই জীবাণুর বা তার উৎসেচকের নামে ‘নিউ ডেলহি’ তথা ‘নয়াদিল্লি’-র স্থান করে দেওয়া হয়েছে।

উৎসেচকটি তৈরি করার জন্য জীবাণুর শরীরে একটি বিশেষ জিনের উপস্থিতি প্রয়োজন। এই জিনটি জীবাণুর বংশবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার অপত্য-জীবাণুদের মধ্যে তো ছড়িয়ে পড়তে পারেই, তা ছাড়াও এটি অন্য জীবাণু, এমনকী সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের জীবাণুর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই আজ কেবল ‘ক্লেবসিয়েলা’ গণ-এর জীবাণুই নয়, অন্য নানা জীবাণুর (যথা এনটেরোব্যাকটর, অ্যাসিনেটোব্যাকটার ইত্যাদি) মধ্যে এই জিন ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তারাও ‘নিউ ডেলহি মেটালো-বিটা-ল্যাকটামেজ-১’ উৎসেচকটি তৈরি করছে আর কার্বাপেনেম-গোত্রের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে পড়ছে। এই উৎসেচকটি বা সেটি তৈরি করার জিন যেসব জীবাণুর শরীরে আছে তাদের সাধারণ নাম হল ‘নিউ ডেলহি মেটালো-বিটা-ল্যাকটামেজ-১’ জীবাণু, বা সংক্ষেপে NDM-1।

সিডিডিইপি-এর রিপোর্ট বলছে, “প্রথম দিকে যেসব ভ্রমণকারী ভারতীয় উপমহাদেশে বা বলকান-অঞ্চলে গিয়ে কোনো কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতেন, কেবল তাঁদের দেহেই ‘নিউ ডেলহি মেটালো-বিটা-ল্যাকটামেজ-১’ যুক্ত জীবাণু পাওয়া যেত। কিন্তু এখন সারা বিশ্ব জুড়েই এইরকম জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে; ফলে বোঝা যাচ্ছে সেসব জায়গায় এই ধরনের জীবাণু স্থানীয়ভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।”

তথ্যসূত্র: *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫
http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Delhi-superbug-now-in-over-70-nations/articleshow/4899428.cms ও
http://en.wikipedia.org/wiki/New_delhi_metallo-beta-lactamase_1 ও
http://www.medicinenet.com/ndm-1/article.htm

Advt

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

রিউম্যাটিক জ্বর ও রিউম্যাটিক হার্টের রোগ

ডা. কুশল সেন

রিউম্যাটিক জ্বর কী?

রিউম্যাটিক জ্বর হল এমন একটি রোগ যা একসঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের (হৃৎপিণ্ড, চামড়া, গাঁট, গাঁটের পর্দা ইত্যাদি) ক্ষতি করে। গ্রুপ 'এ' বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক এক জীবাণু কর্তৃক গলায় প্রদাহের পর এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের ফলে হৃৎযন্ত্রের ক্ষতি ছাড়া আরও কিছু ক্ষতি বা রোগলক্ষণ দেখা দেয়, কিন্তু কিছুদিন পরে হৃৎযন্ত্রের ক্ষতিই কেবল রয়ে যায় ও দীর্ঘস্থায়ী গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে, আর বাকি সব লক্ষণই (যেমন গাঁটে ব্যথা, চামড়ার নীচে ফোলা বা 'গুলটি') সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়।

কীভাবে রিউম্যাটিক জ্বর ক্ষতিসাধন করে?

সাধারণত আমাদের শরীরে যখন কোনো জীবাণু বা অপরিচিত কোনো ক্ষতিকর বস্তু প্রবেশ করে তখন শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নানা পদক্ষেপ নেয়। সেই পদক্ষেপগুলোর উদ্দেশ্য জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলা। সমস্যা হয় তখনই যখন জীবাণু-মারা এই ব্যবস্থা 'ভুল করে' আমাদের নিজেদের দেহের কোনো অংশকে আক্রমণ করে। নানা কারণে আমাদের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা এইরকম ভুল করতে পারে। রিউম্যাটিক জ্বরে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে আমাদের দেহকেই আক্রমণ করে, আর তার কারণ হল, গ্রুপ 'এ' বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক জীবাণুটির কোষের গঠনের (M- প্রোটিন) সঙ্গে মানুষের শরীরের কিছু কোষকলার (যেমন গাঁটের পর্দা, হৃৎপিণ্ড, চামড়া ইত্যাদি) গঠনের মিল আছে। মানুষের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ওই জীবাণুদের মারার চেষ্টা করলে ওই কোষকলাগুলোও সেই আক্রমণে মারা পড়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে গাঁটে ব্যথা, গাঁট ফোলা, জ্বর ইত্যাদি হয়। আর সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয় হৃৎযন্ত্রে।

গ্রুপ 'এ' বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক জীবাণু কর্তৃক গলায় প্রদাহ হওয়া রোগীদের মধ্যে ৩% রোগীর রিউম্যাটিক জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রিউম্যাটিক জ্বর কাদের হয়?

এই রোগের প্রথম পর্যায়ের লক্ষণগুলো হল মূলত গলার প্রদাহ ও জ্বর। গলার প্রদাহের জন্য গলা ব্যথা, কাশি, গলার ভেতরটা লাল হয়ে যাওয়া, এইসব হয়। সাধারণভাবে ৫-১৮ বছর বয়সি বাচ্চাদের এই পর্যায়টা, বা প্রাথমিক লক্ষণগুলি, বেশি দেখা যায়। বয়ঃসন্ধিকালীন এবং যুবক যুবতীদের মধ্যে এই প্রাথমিক লক্ষণগুলি তেমন বেশি দেখা যায় না, এবং ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে এই রোগ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু এই রোগের ফলে হৃৎপিণ্ডে যে প্রদাহ হয় (রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিস) তার প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায় ২৫-৪০ বছর বয়সিদের মধ্যে—এদের অনেকেরই ছোটোবেলায় প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল। সাধারণভাবে এই রোগ পুরুষ-নারী উভয়েরই সমানভাবে হয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের রোগ মেয়েদের বেশি দেখা যায়।

গরিব দেশের গরিব মানুষ যাঁরা একই ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে এবং অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হন তাদের মধ্যে এই জ্বরের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কি জনবসতি ভেদে আলাদা?

হ্যাঁ, যেহেতু জীবনযাত্রার মানের উপর এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে তাই এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা জনবসতি ভেদে আলাদা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। যে জনবসতিতে এই রোগ ঘটার হার (incidence) বছরপ্রতি ১০০,০০০ স্কুলপাঠরত (৫-১৮ বছর বয়সি) বাচ্চাদের মধ্যে ২ জনের কম এবং এই রোগের প্রাদুর্ভাবের হার (prevalence) বছরপ্রতি ১০০০ জনে ১ জনের কম সেই জনবসতিকে কম বিপদসংকুল (low risk) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অন্যথায় তা অধিক বিপদসংকুল (high risk) হিসাবে গণ্য হয়।

এখানে 'রোগ ঘটার হার' (incidence) ও 'প্রাদুর্ভাব'-এর হার (prevalence) এ-দুটো একটু বুঝিয়ে বলি। ধরা যাক এক গ্রামে জনসংখ্যা ১০০০, আর সেই গ্রামে এক বছরে টিবি বা যক্ষ্মা রোগটা ১০ জনের হয়েছে। তাহলে সেই গ্রামে যক্ষ্মার 'রোগ ঘটার হার' বা 'ইনসিডেন্স' হল ১০০০ এর মধ্যে ১০। কিন্তু টিবি রোগ তো হলেই সেরে যায় না, তাই নতুন টিবি রোগীর সংখ্যা সে-বছরে ১০ জন বাড়লেও, আগের ১২জন টিবি রোগী সে-বছরেও টিবিতে ভুগছেন। তাই যদি কোনো এক সময় আমরা টিবি ধরার জন্য সব গ্রামবাসীকে পরীক্ষা করি, দেখব মোট ২২ জন টিবি রোগী আছেন। আমরা বলব, সেই গ্রামে টিবি রোগের 'প্রাদুর্ভাব' বা 'প্রিভ্যালেন্স' হল ১০০০ এর মধ্যে ২২। 'প্রাদুর্ভাব' বা 'প্রিভ্যালেন্স' আবার দু-রকম আছে, কিন্তু আমাদের সেসব কথায় গিয়ে এখন কাজ নেই।

আমাদের দেশে এই রোগ ঘটার হার বা 'ইনসিডেন্স' বছরপ্রতি ১০০-২০০ প্রতি ১০০,০০০; ৫-১৪ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে, যা উন্নত দেশগুলির তুলনায় প্রায় ১০০-২০০ গুণ বেশি।

রোগের লক্ষণ: কী কী হয় এই রিউম্যাটিক জ্বরে?

সাধারণত গলায় প্রদাহের ১-৫ সপ্তাহ (গড়ে ৩ সপ্তাহ)-এর মধ্যে এই জ্বরের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। বহুক্ষেত্রেই এই রোগে গলার প্রদাহের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় না এবং রোগী অনেকক্ষেত্রেই গাঁটের বা হার্টের সমস্যা নিয়ে প্রথম ডাক্তার দেখাতে আসেন। এবং এইসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই জীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি (প্রতিরোধ ব্যবস্থা)-র রক্তে উপস্থিতি দেখে এই রোগ নির্ণয় করতে হয়।

- হৃদ্‌রোগ—প্রায় ৬০ শতাংশ রোগীদের হৃদ্‌রোগ থাকে। এই রোগে হৃদ্‌যন্ত্রের আন্তরদেওয়াল (Endocardium), বহিঃদেওয়াল (Pericardium) অথবা পেশিসম্বলিত দেওয়াল (Myocardium) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে, হৃদ্‌যন্ত্রের দরজা বা ভালভ (প্রধানত মাইট্রাল ভালভ, কখনো তার সঙ্গে অ্যাওরটিক ভালভ্‌-এর সমস্যা এই রোগের নিশ্চিতকরণ লক্ষণ। এর ফলে নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায় ও হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর রক্তের স্বাভাবিক চলাচল ব্যহত হয়। হার্টফেল পর্যন্ত হতে পারে। একে রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিস বলে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে এই হৃদ্‌রোগ সুপ্ত অবস্থায় থেকে গেছে (subclinical carditis)। ফলে বর্তমানে এই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইকো-কার্ডিওগ্রাফির ভূমিকা বেড়েছে।
- গাঁটে ব্যথা—প্রায় ৬০-৭৫% রোগীদের ক্ষেত্রে গাঁটের সমস্যা দেখা যায়। শরীরের যেসব বড়ো গাঁট আছে যেমন হাঁটু, কনুই, কবজি, গোড়ালি —এইসব ফুলে যায়, গাঁটে ব্যথা হয়। কারোর কারোর ক্ষেত্রে একের পর এক গাঁট ফোলে, কারোর কারোর ক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেক গাঁট ফুলতে পারে। কখনো কখনো আবার একটি মাত্র গাঁটে ব্যথা নিয়েও এই রোগ প্রকাশ পেতে পারে।
- ১০০ জনের মধ্যে ২০ জনের চামড়ার সমস্যা দেখা দেয়। চামড়ার নীচে ০.৫-২ সেন্টিমিটার লম্বা গুটলি দেখা যায় (subcutaneous nodules)। এতে ব্যথা থাকে না। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে এগুলো মিলিয়ে যায়। আর সাধারণত এদের দেহে হৃদ্‌রোগও বর্তমান থাকে।
- ১০০ জনের মধ্যে ১০ জনেরও কম রোগীর চামড়ায় একধরনের দাগ দেখা যায়—এবড়োখেবড়ো গোলাপি বর্ডার, মাঝখানটা হালকা রঙের। এগুলো চুলকায় না। সাধারণত বুকে, পিঠে, পেটে কখনো-সখনো বা হাতে ও পায়ে এই দাগ দেখা যায় কিন্তু মুখে কখনোই এই দাগ হয় না। এগুলো খুব অল্প সময় থেকেই মিলিয়ে যায়। কখনো কখনো ডাক্তারের চোখের সামনেই দাগগুলো দেখা দিতে পারে এবং মিলিয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে চামড়ার রং সাহেবদের চাইতে অনেকটাই কালো, তাই এই গোলাপি রংটা তেমন কোনোভাবে বোঝা যায় না, রোগী ডাক্তারের কাছে যাবার তাগিদ অনুভব করেন না, আর ডাক্তারও এই দাগটাকে রিউম্যাটিক জ্বরের লক্ষণ হিসেবে চিনতে পারেন না।
- খুব কম সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে একধরনের খিঁচ ও অঙ্গভঙ্গি দেখা যায়—একে বলে সিডেনহামস কোরিয়া। মেয়েদের মধ্যে এই লক্ষণ বেশি দেখা যায়।
- এসব ছাড়া জ্বর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সর্দি ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জ্বর উচ্চমাত্রায় হলেও গুমগুমে জ্বরও এই রোগের লক্ষণ।

রোগ নির্ণয়

এই রোগ নির্ণয়ের জন্য ১৯৪৪ সালে ডা. টি. ডাকেট জোনস্‌ কিছু মানদণ্ড স্থির করে দেন। ১৯৯২ সালে এই রোগ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ার পর এই মানদণ্ডের কিছু পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে ইকোকার্ডিগ্রাফির সহজলভ্যতা এবং চল দুই-ই বৃদ্ধি পাওয়ায় সুপ্ত হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ছে এবং এই রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হচ্ছে। ফলত ২০১৫ সালে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (AHA) ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে ধরা পড়া সুপ্ত হৃদ্‌রোগকে এই মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং জনবসতি অনুযায়ী পৃথিবীকে অধিক বিপদসংকুল এবং কম বিপদসংকুল (High-risk and Low-risk) এই দুই ভাগে ভাগ করে এই মানদণ্ডের গণ্ডির পরিবর্তন করেছেন।

রোগ নির্ণয় হয়ে যাওয়ার পর ও একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ইকোকার্ডিওগ্রাফি ও রক্তে এ.এস.ও.-এর মাত্রা মাপা প্রয়োজন শরীরে রোগের প্রগনসিস বা রোগের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ এবং চিকিৎসার পরিবর্তনের প্রয়োজন নির্ধারণ করার জন্য। এই রোগ নির্ণয়ে এবং প্রতিরোধে ইকোকার্ডিওগ্রাফির ভূমিকা বেড়ে চলেছে।

প্রধান মানদণ্ড

কম বিপদসংকুল এলাকায়	বেশি বিপদসংকুল এলাকায়
হৃদ্‌যন্ত্রে প্রদাহ	**হৃদ্‌যন্ত্রে প্রদাহ**
ক্লিনিক্যাল বা লক্ষণযুক্ত এবং সাবক্লিনিক্যাল বা সুপ্ত	ক্লিনিক্যাল বা লক্ষণযুক্ত এবং সাবক্লিনিক্যাল বা সুপ্ত
গাঁট ফোলা ও ব্যথা	**গাঁট ফোলা ও ব্যথা**
একাধিক গাঁট রোগগ্রস্ত হলে তবেই তা রিউম্যাটিক জ্বরের লক্ষণ বলে ধরা হবে	এক বা একাধিক গাঁট ফোলা, একাধিক গাঁটে ব্যথা
সিনডেহাম্‌স কোরিয়া	**সিনডেহাম্‌স্‌ কোরিয়া**
এরিথেমা মার্জিনেটাম	**এরিথেমা মার্জিনেটাম**
চামড়ার নীচে গুটলি	**চামড়ার নীচে গুটলি**

অপ্রধান মানদণ্ড

কম বিপদসংকুল এলাকায়	বেশি বিপদসংকুল এলাকায়
বহু গাঁটে ব্যথা (polyarthralgia)	একটি গাঁটে ব্যথা (monoarthralgia)
জ্বর (>৩৮.৫° সে.)	জ্বর (>৩৮° সে.)
ই এস আর ≥ ৬০ মিমি এবং/	ই এস আর ≥৩০ মিমি এবং/
অথবা সি আর পি≥৩ মিগ্রা/ডেসিলি:	অথবা সি আর পি ৩ মিগ্রা/ডেসিলি:
ইসিজি-তে PR interval বড়ো	ইসিজি-তে PR-interval বড়ো

অত্যাবশ্যক মানদণ্ড

এগুলোর থেকে প্রমাণ হয় যে কিছুদিন আগে রোগীর শরীরে গ্রুপ 'এ' বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক জীবাণুটির সংক্রমণ হয়েছিল।

১. গলার লালা পরীক্ষায় ওই জীবাণুর উপস্থিতি

২. র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্ট

৩. রক্তে এ.এস.ও. টাইটার বেশি বা এর মাত্রা ক্রমবর্ধমান

অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই প্রথম দুটো পরীক্ষায় কিছু পাওয়া যায় না। ফলে রক্তে এ.এস.ও.-এর মাত্রা অথবা এ.এস.ও.-এর ক্রমবর্ধমান মাত্রা নির্ণয় এই রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

রোগ নির্ণয়ে নিশ্চিত হতে গেলে

২টি প্রধান মানদণ্ড অথবা একটি প্রধান ও দু-টি অপ্রধান মানদণ্ড এবং সঙ্গে অত্যাবশ্যক মানদণ্ড থাকতে হবে।

- **এ.এস.ও. জিনিসটা কী?**

  এর পুরো কথা হল অ্যান্টি স্ট্রেপ্টোলাইসিন ও। রিউম্যাটিক জ্বরের জন্য দায়ী জীবাণু গ্রুপ 'এ' বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস 'স্ট্রেপ্টোলাইসিন ও' নামে এক অ্যান্টিজেন তৈরি করে। শরীর এই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করে, তার নামই এ.এস.ও.। গলায় ওই জীবাণুর সংক্রমণ হলে রক্তে এই অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেড়ে যায়। রক্তে এই অ্যান্টিবডির উপস্থিতি বা রক্তে এই অ্যান্টিবডির ক্রমবর্ধমান মাত্রা এই রোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **এ. এস. ও-এর পরিমাণ বেশি বলা হয় কখন?**

  যদি রক্তে এর মাত্রা বড়োদের ক্ষেত্রে ২৪০-এর বেশি এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৩৩০-এর বেশি হয়, তখন এ.এস.ও.-এর পরিমাণ বেশি বলা হয়।

রিউম্যাটিক জ্বরের চিকিৎসা কী?

- বিশ্রাম।
- দশ দিনের জন্য পেনিসিলিন গ্রুপের কোনো ওষুধ দিতে হয়। যদি পেনিসিলিনে অ্যালার্জি থাকে তাহলে এরিথ্রোমাইসিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
- গাঁটে ব্যথা কমানোর জন্য অ্যাস্পিরিন দেওয়া হয় প্রতিদিন ৫০-৬০ মিগ্রা প্রতিকেজি দৈহিক ওজন থেকে সর্বোচ্চ দৈনিক ৮০-১০০ মিগ্রা প্রতিকেজি দৈহিক ওজন হিসাবে।

রিউম্যাটিক হৃদ্‌রোগ মূলত একটি প্রতিরোধযোগ্য অসুখ। মানুষ যদি সত্যিই মানুষের মতো বাঁচতে পারে, তাহলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কমে যায়

- যাদের হৃদ্‌যন্ত্রে প্রদাহ আছে, বিশেষ করে যাদের হার্টফেল হচ্ছে তাদের কখনো কখনো প্রেডনিসোলন (স্টেরয়েড) দিয়ে চিকিৎসা করা হয় (শুরুতে দৈনিক ১-২ মিগ্রা প্রতিকেজি দৈহিক ওজন হিসাবে, পরে এর মাত্রা আস্তে আস্তে কমাতে হয়)।
- সাধারণত ৪-৬ সপ্তাহ ওষুধ চালাতে হয় অথবা যতক্ষণ না ইএসআর স্বাভাবিক হচ্ছে এবং রোগী সুস্থ হচ্ছেন।
- রোগের তীব্র দশা (acute phase) কমে গেলে রোগীর প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা শুরু করতে হবে।
- যেহেতু বার বার রিউম্যাটিক জ্বর হতে থাকলে হৃদ্‌পিণ্ডের ভালভ্-এর ক্ষতি হয় তাই এই রোগ আটকাতে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা চালাতে হয়।

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা

- **প্রাথমিক প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা:** এর লক্ষ্য হল এই রোগের কারণ (risk factor) গুলি, যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক জীবাণু কর্তৃক গলায় প্রদাহ হওয়া আটকানো, প্রধানত সেইসব গাদাগাদি করে থাকা মানুষদের মধ্যে। কিন্তু ভারতের মতো দেশে যেখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি সেখানে এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভবপর নয়।
- সেকেন্ডারি (মধ্যপর্যায়ের) প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা: এটা করা হয় রিউম্যাটিক জ্বর হবার পর তার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষতি আটকানোর জন্য।

  বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন জি ১২ লাখ ইউনিট (রোগীর ওজন ৩০ কেজির বেশি হলে) বা ৬ লাখ ইউনিট (রোগীর ওজন ৩০ কেজির কম হলে), পাছার মাংসপেশিতে লাগাতে হয় ২১ দিন ছাড়া ছাড়া।

  অথবা

  পেনিসিলিন ভি ২৫০ মিগ্রা. বড়ি রোজ দিনে দু-বার খেতে হয়। কিন্তু এটা বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন জি-এর থেকে কম কার্যকরী।

  অথবা

  এরিথ্রোমাইসিন ২৫০ মিগ্রা. বড়ি রোজ দিনে দু-বার খেতে হয়।

  পেনিসিলিনে অ্যালার্জি না থাকলে রোজ দিনে দু-বার বড়ি খাওয়ার তুলনায় ২১ দিন ছাড়া ইঞ্জেকশন নেওয়া ভালো, এতে খরচও অনেক কম পড়ে।

কতদিন এই প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা চলবে?

রোগের ধরন	চিকিৎসার সময়সীমা
কেবল রিউম্যাটিক জ্বর (হার্টের রোগ না থাকলে)	শেষবার রিউম্যাটিক জ্বর হওয়ার পর থেকে ৫ বছর অথবা ২১ বছর বয়স অবধি (যেটা বেশি)
হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ থাকলে কিন্তু ভালভ্-এর কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকলে	শেষবার রিউম্যাটিক জ্বর হওয়ার পর থেকে ১০ বছর অথবা ২১ বছর বয়স অবধি (যেটা বেশি)
দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ থাকলে এবং ভালভ্ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে, কৃত্রিম ভাল্‌ভ বসানো হয়ে থাকলে।	শেষবার রিউম্যাটিক জ্বর হওয়ার পর থেকে ১০ বছর অথবা ৪০ বছর বয়স অবধি (যেটা বেশি) কখনো কখনো সারাজীবন।

শেষ কথা হল, রিউম্যাটিক জ্বর ও রিউম্যাটিক হৃদ্‌রোগ মূলত একটি প্রতিরোধযোগ্য অসুখ। মানুষ যদি সত্যিই মানুষের মতো বাঁচতে পারে, তাহলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই কমে যায়, যেমনটা ইউরোপ- আমেরিকায় হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই রোগ আছে, সমাজ না বদলালে, বহুদিন থাকবে। ততদিন ডাক্তারদের ওষুধ দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হবে রোগীদের, আর রোগীদেরও বাঁচার তাগিদেই এই নিবন্ধে বলা কথাগুলো যতটা সম্ভব বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, কলকাতার একটি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার ও শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র

কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন, ২০০২

(তৃতীয় অংশ)

২০০২ সালে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (Medical Council of India) ডাক্তারদের অবশ্য পালনীয় একটি 'কোড অফ এথিক্স' তথা 'আচরণবিধির বিধিবদ্ধ আইনসমূহ' জারি করে। তারপর তার কিছু সংশোধন হয়। এখানে আমরা ২০১০ সাল ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত সংশোধন সমেত সেই কোডের অনুবাদের তৃতীয় অংশ পেশ করছি। আইনি বিষয় অনুবাদে ভুলত্রুটি খুব বড়ো অসুবিধা হয়ে দেখা দিতে পারে, তাই পাঠকদের কাছে অগ্রিম অনুরোধ, এই লেখাটিকে জনচেতনা বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র প্রয়াস বলেই মনে করবেন, এবং আইনি কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে ইংরাজিতে লেখা মূল আইনটি দেখে নেবেন। ইন্টারনেটে এই আইনটি ইংরাজিতে পাওয়া যায় মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র ওয়েবসাইটে; আমরা এটি পেয়েছি http://www.mciindia.org/RulesandRegulations/CodeofMedicalEthicsRegulations2002.aspx থেকে।

'মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' (Medical Council of India) বা সংক্ষেপে এমসিআই হল ভারতে সমস্ত ডাক্তারদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এখানে 'ডাক্তার' বলতে আধুনিক চিকিৎসার ডাক্তারদের (লোকমুখে যা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বলে সমধিক পরিচিত) কথা বুঝতে হবে, অন্যান্য ধারার চিকিৎসক, যথা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র নেই।

ভারতে ডাক্তারি (আধুনিক) শিক্ষাব্যবস্থার মান স্থির করা ও তা বজায় রাখা মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র অন্যতম কাজ। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত ডাক্তারি ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ভারতে আইনি মান্যতা পাবে কিনা সেটাও এমসিআই ঠিক করে। ডাক্তারি প্র্যাকটিস করার মান নির্ধারণ করে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও এই সংস্থারই।

মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর একটা আইনি ভূমিকা রয়েছে। কোনো ডাক্তার তাঁর কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করছেন কিনা সেটা দেখার প্রাথমিক আইনি দায়িত্ব মেডিক্যাল কাউন্সিল-এরই। ক্রেতা সুরক্ষা আদালত বা সাধারণ আদালতেও মেডিক্যাল কাউন্সিল ডাক্তারির যে মান নির্ধারণ করে দিয়েছে, মোটামুটি সেই মানই বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। তাই মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র 'কোড অফ এথিক্স রেগুলেশন' ডাক্তার ও রোগী—দু-জনের ক্ষেত্রেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা সেই কোডের অনুবাদ প্রকাশ করছি। এই সংখ্যায় তার তৃতীয় অংশ।

৫. জনগণের প্রতি ও চিকিৎসা-সহায়তা পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের প্রতি চিকিৎসকের দায়িত্ব

৫.১. সুনাগরিক হিসেবে চিকিৎসকের দায়িত্ব

বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে লব্ধ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁদের অধিগত জ্ঞান চিকিৎসকেরা সুনাগরিক হিসেবে সমাজে ছড়িয়ে দেবেন।

জনগোষ্ঠীতে আইন লাগু করতে ও মানবিকতার স্বার্থে যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে সেগুলো চালিয়ে নিয়ে যেতে ডাক্তাররা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। জনস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আইন বিধি জারি করে যে যে প্রশাসনিক দপ্তর, তাদের সহায়তা করাও চিকিৎসকের কর্তব্য।

৫.২. জনস্বাস্থ্য ও জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য

যেসব ডাক্তার বিশেষভাবে জনস্বাস্থ্যের কাজের সঙ্গে যুক্ত, তারা জনসচেতনতা বৃদ্ধিকারী রোগ প্রতিরোধক কোয়ারান্টিন রোগীকে সাময়িক আলাদা রাখার আইনি ব্যবস্থা আইন ও পদক্ষেপের ওপর জোর দেবেন, জনগোষ্ঠীকে মহামারী ও সংক্রামক রোগের থেকে রক্ষা করার জন্য। যেসব সংক্রামক রোগী চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন, সেইসব রোগীদের ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে চিকিৎসক জানাবেন যেমনটা যখন মহামারী জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নানা নিয়ম, আইন ইত্যাদি দ্বারা ঠিক করবেন। যখন মহামারী ছড়াবে তখন চিকিৎসক সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে চিকিৎসা করা থেকে পিছিয়ে যাবেন না।

ফার্মাসিস্ট ও নার্স

চিকিৎসককে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা সহায়ককারী কাজ, যেমন—ফার্মাসিস্ট, নার্স—এঁদের পেশা হিসেবে স্বীকৃতি জানাতে হবে ও প্রোমোট করতে হবে এবং প্রয়োজনে এঁদের সহায়তাও চাইতে হবে।

৬. অনৈতিক

কোনোরকম অনৈতিক কাজের সঙ্গে চিকিৎসক নিজেকে জড়াবেন না বা সাহায্য করবেন না বা প্রতিশ্রুতি দেবেন না।

৬.১. বিজ্ঞাপন

চিকিৎসকের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে, নিজে বা কোনো

সংস্থার মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, রোগী টানার চেষ্টা অনৈতিক। একজন চিকিৎসক নিজেকে বা নিজের নামকে যেকোনো উপায়েই হোক (একা বা অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে) কোনো বিজ্ঞাপন বা প্রচারের কাজে লাগাতে পারেন না, যাতে তার পেশাদার পদ, দক্ষতা, যোগ্যতা, সাফল্য, অধিগত বিদ্যা, বিশেষত্ব, কর্ম, সঙ্গ, সম্মান বড়ো করে দেখানো হয়। একজন চিকিৎসক কোনো ব্যক্তিকে কোনো কিছুর বিনিময়ে বা বিনিময় ছাড়াও কোনো ড্রাগ, ওষুধ, হাতুড়ে চিকিৎসা, অপারেশন, ভেষজ কোনো পদার্থ বা কোনো পণ্যদ্রব্য, কোনো সম্পত্তির দলিলের কোনো অংশ, কোনো অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা ইত্যাদি কোনো কিছুই তিনি অনুমোদন করবেন না বা সুপারিশ করবেন না বা এগুলি সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি বা রিপোর্ট লিখবেন না যেখানে তার নাম, সই বা ছবি ব্যবহার করে এই অনৈতিক কার্যকলাপগুলির প্রচার ও প্রসারর চালানো যায়। তবে একজন চিকিৎসকের প্রেসে কিছু বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার অনুমোদন আছে। সেগুলো হল—

১. প্র্যাকটিস শুরু
২. প্র্যাকটিসের ধরনের পরিবর্তন
৩. ঠিকানা পরিবর্তন।
৪. কিছু সময়ের জন্য কর্মবিরতি
৫. অন্য চিকিৎসা/প্র্যাকটিস পুনরারম্ভ করা
৬. অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি/প্র্যাকটিস অনুসরণ করা
৭. পারিশ্রমিক জনসমক্ষে ঘোষণা করা

৬.১.২. লেটারহেডে বা প্রেসক্রিপশন প্যাডে চিকিৎসকের কোনো ছবি, কোনোরকম প্রচার বা যে ঘরে চিকিৎসক রোগী দেখেন সেই স্থান ছাড়া অন্যত্র সাইনবোর্ডে বা অন্যভাবে নিজের বা ক্লিনিকের কোনোরকম প্রচার অনৈতিক। তবে মানব শরীরের কোনো ছবি, ডায়াগ্রাম বা কোনো স্কেচ ইত্যাদি যদি থাকে সেগুলো অনৈতিক বলে পরিগণিত হবে না।

৬.২.২. পেটেন্ট ও কপিরাইট

চিকিৎসার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির ওপর, ওষুধ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ওপর চিকিৎসক পেটেন্ট বা কপিরাইট নিতে পারেন। যদি বিশাল জনগোষ্ঠী সেই পেটেন্ট বা কপিরাইটের জন্য আবিষ্কারটির সুবিধা না পায় তাহলে সেটা অনৈতিক।

৬.৩. দোকান চালানো (চিকিৎসকের দ্বারা ওষুধ বা যন্ত্রপাতি বিক্রি করা)

একজন চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ লিখেছেন সেগুলো অন্য একজন চিকিৎসক খোলা দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করতে পারবেন না বা ডাক্তারি ও অপারেশনের যন্ত্রপাতি বিক্রির দোকান চালাতে পারবেন না। যতদূর সম্ভব রোগী যাতে শোষিত না হন, সেটা বিবেচনা করে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রে সেইরকম নির্দেশ দিতে পারেন, বা ওষুধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারেন, সেটা অনৈতিক নয়। যেসব ওষুধ চিকিৎসক নিজে দেবেন বা দোকান থেকে কেনার জন্য ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন, সেইসব ওষুধের বাণিজ্যিক নামের সঙ্গে জেনেরিক নামও সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৬.৪. ছাড় দেওয়া এবং কমিশন

৬.৪.১. একজন চিকিৎসক কোনো রোগীকে কোথাও সুপারিশ করলে, কোথাও পাঠালে অথবা কোনো রোগীকে অন্য কোনো চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য, অপারেশনের জন্য বা অন্য চিকিৎসার জন্য পাঠালে, তিনি কোনোরকম উপহার, গ্র্যাচুইটি, কমিশন বা বোনাস নিতেও পারবেন না বা দিতেও পারবেন না বা এর জন্য অনুরোধও করতে পারবেন না। চিকিৎসক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই রোগীর দেয় পারিশ্রমিক ভাগাভাগি, স্থানান্তর, নিয়োগ, ছাড় দেওয়া, ইত্যাদি করতে পারবেন না, তা সেই পারিশ্রমিক অপারেশনের জন্য বা অন্য চিকিৎসার জন্য যে কারণেই রোগী দিয়ে থাকুন না কেন।

৬.৪.২. ৬.৪.১. অনুচ্ছেদের যে আইনি ধারা তা, কোনো চিকিৎসক বা কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রোগীকে কোথাও সুপারিশ করেন, কোথাও পাঠান অথবা তাদের কাছে কোনো রোগী এলে, রোগ নির্ণয়ের জন্য কোনো নমুনা বা উপাদান পাঠালে বা এলে, অন্য পরীক্ষা/কাজের জন্য পাঠালে বা এলে—উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে বলবৎ হবে।

চিকিৎসকের অধীনে কর্মরত অন্য চিকিৎসক বা অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তি, যারা চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন—চিকিৎসক তাদের বেতন দিতে পারেন; সেই নিয়ে এই ধারায় কিছু আপত্তি নেই।

৬.৫. গোপনীয় প্রতিকার

কোনো চিকিৎসকের কোনো 'গোপন' ওষুধ লেখা, যার উপাদান তিনি জানেন না, বা এরকম ওষুধ তৈরি করা বা ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া, বেআইনি কাজ। চিকিৎসক যে ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন, সবসময়ই সেই ওষুধটির বাণিজ্যিক নামের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে জেনেরিক নামও লিখতে হবে।

৬.৬. মানবাধিকার

কোনো চিকিৎসক কোনোভাবেই মানসিক বা শারীরিক নির্যাতনে সাহায্য করবেন না বা প্ররোচনা দেবেন না, কাউকে কোনোরকম মানসিক ও শারীরিক আঘাত দেওয়ায় শরিক হবেন না, কোনো ব্যক্তি বা এজেন্সি কর্তৃক কোনো আঘাত লুকিয়ে ফেলা বা গোপন করা যা স্পষ্টতই মানবাধিকার লঙ্ঘন করা, তার শরিক হবেন না।

৬.৭. ইচ্ছামৃত্যু

ইচ্ছামৃত্যু ঘটানো অনৈতিক। কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের মৃত্যুর পরেও যন্ত্রদ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের ক্রিয়া অব্যাহত রাখার যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাকে প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে চিকিৎসারত চিকিৎসক একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, তাঁকে চিকিৎসক দলের পরামর্শ নিয়ে একযোগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চিকিৎসকদল কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। এই চিকিৎসক দলে থাকবেন রোগীর চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার, চিফ মেডিক্যাল অফিসার এবং তার দ্বারা মনোনীত হাসপাতালের কোনো ডাক্তার অথবা অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন, ১৯৯৪ ধারা অনুযায়ী যোগ্য কোনো ব্যক্তি।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে

- জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসকেরা তাঁদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান, জনগণের মধ্যে ও চিকিৎসা পেশায় সহকারি কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, ও জনস্বাস্থ্য-সুরক্ষার আইনি ব্যবস্থায় সহায়তা করবেন; তিনি নিজের সংক্রমণের ভয় তুচ্ছ করে ছোঁয়াচে রোগের চিকিৎসা করবেন।
- নিজের পেশার সাহায্যকারী ফার্মাসিস্ট, নার্স ইত্যাদিদের সাহায্য চিকিৎসক নেবেন, ও তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন।
- চিকিৎসকরা কোনো অনৈতিক কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন না। বিশেষ করে রোগী বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন বা প্রচারে নিজের যোগ্যতা ইত্যাদি বড়ো করে দেখানো চলবে না। হাতুড়ে চিকিৎসা, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা, ইত্যাদি ব্যাপারে চিকিৎসক নিজের পেশাকে ব্যবহার করবেন না। প্র্যাকটিস শুরু, স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার ছাড়া চিকিৎসক কোনো বিজ্ঞাপন দেবেন না।
- চিকিৎসক তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ওপর পেটেন্ট নিতে পারেন, কিন্তু যদি সেই পেটেন্ট বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মঙ্গলের পথে অন্তরায় হয় তবে তা অনৈতিক।
- চিকিৎসক ওষুধের খোলা দোকান চালাবেন না। কিন্তু রোগীকে শোষণ না করে তিনি তাঁকে ওষুধ ইত্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে পারেন। বাজারি নামের সঙ্গে ব্যবস্থাপত্রে জেনেরিক নামের স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।
- রোগী পাঠানোর জন্য কোনোরকম উৎকোচ, কমিশন, উপহার ইত্যাদির লেনদেন অনৈতিক।
- চিকিৎসক কোনো 'গোপন ওষুধ', যার উপাদান তিনি জানেন না, তা লিখবেন না বা কোনোভাবে তাতে উৎসাহদান করবেন না।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এমন কাজ, যথা উৎপীড়ন বা উৎপীড়নকে গোপন করা—এমন কাজে চিকিৎসকের লিপ্ত হওয়া অনৈতিক।
- স্বেচ্ছামৃত্যুতে সাহায্য করা চিকিৎসকের পক্ষে অনৈতিক কাজ। কোনো মানুষের মস্তিষ্কের মৃত্যু হয়ে যাবার পর যদি কৃত্রিম ব্যবস্থা দ্বারা তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র-ফুসফুসের কাজ চালানো থাকে, তবে সেই কৃত্রিম ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত তাঁর চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক একা নিতে পারেন না; একটি যথাযথভাবে গঠিত চিকিৎসকদলই কেবল সেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পরবর্তী সংখ্যায় এই অনুবাদের পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হবে।
অনুবাদ করেছেন দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়।

Advt

যে আঘাত সবার

অনীক চক্রবর্তী

লেখাটির প্রথম তিনটি অংশ ডা. অভয় সরকারের ওপর আক্রমণের তাৎক্ষণিকতায় ফেসবুকে তুলে ধরেছিলাম। সেগুলো অপরিবর্তিত রেখেই শেষে আরেকটি অংশ জুড়ে দিলাম। বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেখার দায় . . .

১.

অভয়দা-কে আমি চিনি না। আরও যারা চেনেন না, তাদের জন্য বলি, অভয়দা S.S.K.M.এ Orthopaedics-এর পিজিটি। কাল (০৯.০৯.১৫) এক অ্যাক্সিডেন্টের রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শাসকদলের এক নেতার মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনী তাকে ওয়ার্ডের মধ্যেই মেরে, হাত পা ভেঙে ফেলে রেখে যায়। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা কেউ অভয় সরকারকে চিনি না।

এবং আমি আমার আগত মৃত্যুর দিব্যি কেটে বলছি, আমার একটুও খারাপ লাগছে না। একবারও মনে হচ্ছে না একটা কিছু হেস্তনেস্ত করা উচিত। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। না চিনলেও আমি কেমন একটা ভাইসুলভ অধিকারের আলখাল্লা নিজেই নিজের গায়ে চাপিয়ে 'অভয়দা' বলে ডাকছি। অভয়দার হওয়ারই ছিল এটা। আজ নয় কাল নয় পরশু। হতই। কারণ

আমাদের হাজার রাগ, হাজার প্রতিবাদ আমরা যুগে যুগে পোসেঞ্জিত আর অমিতা বচ্চনের মধ্যে দিয়ে বেঁচে, রুপোলি পর্দায় ভিলেন কেলিয়ে ইজাকুলেট করে দিয়েছি

অভয়দা সেই প্রজাতির এক জীব যে বিবর্তনের এক অদ্ভুত মোড়ে এসে স্বেচ্ছা অন্ধতা আরোপ করেছে নিজের অস্তিত্বে। 'যে মারাচ্ছে মারাক, আমার তো গায়ে আঁচ লাগেনি ভাই'—যে শ্রেণির সহজপাঠ বইয়ের ওপরে গোটা গোটা করে লেখা। যে শ্রেণি শুধু ছলে বা কৌশলে পালানোর কম্পিটিশনে নাম লিখিয়েছে, তার কোনো বল নেই বলে। নিজের জীবনে খুব কম করে হলেও হাজারটা মানুষের ওপর ঘটা হাজারটা অন্যায় দেখেছে অভয়দা, এবং একটাও টুঁ করেনি, কারণ বেঁচে থাকতে হবে বস, অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে বেঁচে থাকা যায় না। আমাদের হাজার রাগ, হাজার প্রতিবাদ আমরা যুগে যুগে পোসেঞ্জিত আর অমিতা বচ্চনের মধ্যে দিয়ে বেঁচে, রুপোলি পর্দায় ভিলেন কেলিয়ে ইজাকুলেট করে দিয়েছি, আর হল থেকে বেরিয়ে লেবেঞ্চুস চুষেছি আচ্ছা করে। এই যে 'ওর যা হচ্ছে হোক, আমি তো সটকে থাকি'-টাই আমাদের গণ স্টেটমেন্ট, আমাদের জিনা ইসি কা নাম হ্যায়। পেঁয়াজের দাম বাড়ছে—বস ক্যাজ কাটাও, টেট পিছিয়ে গেল—বস তোমার কী, চাষিরা আত্মহত্যা করল—ওফফ, বস কাউন্টার নাও, বিদ্যুতের দাম বাড়ছে—ধুর বস, কাটাও তো। আয়লান কুর্দি আমাদের স্ক্রিন নোংরা করে দিলে আমরা অডির ছবি হোমস্ক্রিনে সেট করেছি, কালবুর্গিকে ফেলে আমরা শিনা বোরা গিলেছি, FTII-খুলি খিড়কি-নগ্নতা নিয়ে ন্যূনতম জানাবোঝাপড়া না রেখে আমরা তমোঘ্নকে ছিঁড়ে খেয়েছি। ওরে বাবা, কত কিছু বলে ফেললুম গো! আমরা তো দিনের শেষে নিজের ফ্যামিলি-কেরিয়ার আর প্রেম ছাড়া করেছি বলতে গসিপ, তুলেছি বলতে সেলফি আর খেয়েছি বলতে ঢপ। আমাদের সময় নেই, কোনো কিছু নিয়েই পড়ে থাকার মতো সময় নেই এবং সত্যি স্বীকার করলে, আমাদের চিৎকার করার মতো সাহস, বোঝাপড়ার মতো সেরিব্রাল ক্যাপাসিটি আর মানুষের হাত ধরার মতো হৃদয় নেই। আমার নেই, আপনার নেই, অভয় সরকারের নেই। এবং তাই অভয়দা বেঁচে পালাতে পারেনি, আমি পারিনি, আর আপনিও পারবেন না।

২.

আপনি শেষ কবে শুনেছেন ভুল সওয়াল করার জন্য কোনো উকিলকে ধরে পিটিয়েছে সাধারণ মানুষ (ইনফ্যাক্ট, প্রতিটা কেসেই তো কোনো একজন উকিল মিথ্যে সওয়াল করেন), কবে শুনেছেন সরকারি কাজে ঢিলেমির জন্য সরকারি কর্তাকে ফেলে খিস্তি করেছে জনগণ, শেষ কবে সেতুর রেলিং ভেঙে গেলে নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের হাত পা ভেঙে রেখে দিয়েছে গুন্ডাবাহিনী, কোনোদিন সিনেমা ভালো না লাগলে প্রযোজক পরিচালককে গিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এসেছে দর্শক, কবে পুলিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইচ্ছে করে বাজেয়াপ্ত করে হাজারটাকা চাইলে তাকে স্যু করেছেন? বলুন। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করছি তো, বলুন না। না, শোনেননি। কারণ এরা কেউ একটা ভগ্ন পিরামিড সিস্টেমের একেবারে শেষধাপে বসে থাকা একটা অসহায় কেয়ার গিভার হয়নি। একটা নেই-রাজ্যের নৈরাজ্যের দেশে স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্রে শুধু মাথা ভর্তি সাইন-সিম্পটম আর ওষুধের নাম নিয়ে আপনার হাতের সামনে ঘুরে বেড়ায়নি ইমার্জেন্সিতে- ওটিতে-ওয়ার্ডে। শেষ কবে সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে গিয়ে যখন বাইরে থেকে হাজার হাজার টাকা দামের ওষুধ কিনতে হয়েছে তখন ওয়ার্ড মাস্টারকে জিজ্ঞেস করেছেন—কেন ওষুধ কিনব বাইরে থেকে? শেষ কবে হাসপাতালের সুপারকে ঘেরাও করেছেন RSBY -এর জন্য অ্যালোটেড টাকার গোটাটা পাচ্ছি না কেন তা নিয়ে? কবে? শেষ কবে মেডিক্যাল কলেজের ওটি

শেষ কবে পেপারে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বেড়েছে পড়ে একটা জমায়েত করেছেন নিজের পাড়ায়-গ্রামে-শহরে? কবে, কবে, কবে?

মাসের পর মাস বন্ধ থাকলে গণ ডেপুটেশন হয়েছে? শেষ কবে জানতে চেয়েছেন একজন জুনিয়র ডাক্তার সপ্তাহে কত ঘণ্টা ডিউটি দেন? শেষ কবে পেপারে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বেড়েছে পড়ে একটা জমায়েত করেছেন নিজের পাড়ায়-গ্রামে-শহরে? কবে, কবে, কবে?

আসলে আপনাদের ধক নেই। সুপারকে পাঁচমিনিট ঘেরাও করতে হলে যে সাহস যে দূরদর্শিতা যে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন আপনার বিগত সাড়ে চোদ্দ পুরুষের তা ছিল না, আগত পৌনে তেরো পুরুষের তা হবে না। আপনি শুধু ক্যাথারসিস বোঝেন। নিজের রাগ, নিজের না পাওয়া, নিজের অসহায়তা, নিজের কষ্টের পাহাড় ফাটিয়ে যে ক-টা পাথরটুকরো পান, তা হাতের সামনে থাকা মানুষটার মাথা তাক করে ছুঁড়ে মারেন দ্রুত। এই আপনিই সরকারি অফিসে গিয়ে আট ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবেন কিন্তু একটাও টুঁ শব্দ করবেন না, কারণ তাহলে মুখের ওপর আপনার ফাইলটা ছুঁড়ে দিয়ে বের করে দেবে। আসলে আপনি কাজ হাসিল করা বোঝেন। আর আড়ালে জল মাপেন।

আপনি জানেন ডাক্তার আসলে একা। একে মেরে ফেলে রাখলেও এরা একশোটা জন মিলে পাঁচটা দিন স্ট্রাইক করতে পারবে না। পারবেই না। উভয়সংকট যে। ইমেজ, স্টেটাস বজায় রাখতে হবে তো। এ পৃথিবীতে ডাক্তার ছাড়া পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে নিজের ইমেজ প্রমাণের দায় কারও নেই, জানেন আপনি। আপনি এও জানেন কোনো নেতা এসে এদের একটা রেজিস্ট্রেশন বাতিলের থ্রেট মারলে এরা সুরসুর করে বিপি মাপতে বসে যাবে। এবং হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ম্যাডাম, হ্যাঁ জনগণমনঅধিনায়কভারত-ভাগ্যবিধাতা, আপনি ঠিকই জানেন। আমাদের জীবনটা এতই নরম, স্বপ্নগুলো এতই রঙিন, চেতনারা এতই তুলতুলে—আমরা লড়াই কাকে বলে জানিই না। আমাদের কোনো বন্ধু নেই, শুধু কেরিয়ার আছে। আমাদের কোনো বোঝাপড়াই নেই, শুধু সুখযাপন আছে। আমাদের শিন বোন ভাঙবেন না তো কি স্বাস্থ্য নিয়ে আন্দোলন করবেন বলুন? আর মিডিয়া তো সত্য, শিব ও সুন্দর। সেইই তো আপনার নকুলদানা সাইজের মাথায় ঠুসে রেখেছে, ডাক্তার মানেই ভিলেন। ব্যস, পেটান মনের সুখে। প্রিয়জনের স্ট্রোক হলে ডাম্বেল ভেঁজে হাসপাতালে আসুন, হাঁপানির টান উঠলে বাংলা চার্জ করে ঢুকুন ওয়ার্ডে। আমরা পেতে আছি আমাদের চিরবাধ্য পিঠ . . .।

৩.

আমি সত্যিই রাজনীতি বুঝি না। তাই 'শ্রেণি সংগ্রাম' এর ব্যাখ্যা ভুল বুঝেতে পারি, তবে যুক্তশব্দ ভেঙে অর্থ করলে যা বুঝি, সেটা হল, প্রতিটা শ্রেণির আলাদা আলাদা করে লড়াই আছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক স্তরে। সেটা কখনো ওভার অল সিস্টেমের সঙ্গে, কখনো অন্য শ্রেণির সঙ্গে। বাস্তব, তার সমস্যাগুলোর অনুভব বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে বিভিন্ন। শিক্ষা সচেতনতা একটা দূর পর্যন্ত এক শ্রেণির মানুকে অন্য শ্রেণির যন্ত্রণায় সমব্যথী করে তুলতে পারে বা লড়াইয়ের শরিক করাতে পারে কিন্তু সেটা আদর্শগত লেভেলে খুবই আশার কথা হলেও বাস্তবে লড়াইটা লড়তে হবে নির্দিষ্ট শ্রেণিকেই। (সেটা কোন স্তরে গিয়ে যৌথ সংগ্রাম হবে সেটা কোনো আলোচনার বিষয় নয়)। আমার সারামাসে বিদ্যুতের বিল আসে দু-শো টাকা, সেটা আমার মাসিক আয়ের কত শতাংশ তা হিসেব করতে গেলে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসতে হবে। অতএব আমি বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব আন্দোলনে, এ হয়তো হবে না। কিন্তু আমি একটা স্তর পর্যন্ত সেই মানুষগুলোর দৈনন্দিনতার শরিক যাদের মাশুল বৃদ্ধিতে যায় আসে। বা আমি এর পেছনের নোংরা ব্যাবসাটা বুঝি। তাই আমি রাস্তায় না নামলেও এই আন্দোলনটার শরিক হব একটা স্তর পর্যন্ত। লড়াইটা যদিও মূলত আঘাত পাওয়া মানুষগুলোই করবে।

আমরা ডাক্তার হিসেবে কোনো লড়াই করতেই পারব না। কারণ আমাদের কোনো গোষ্ঠী চেতনাই নেই। এমনিতেই গোষ্ঠী হিসেবে আমরা ক্ষুদ্র। প্রতিবছর এ রাজ্যে হয়তো হাজারজন ডাক্তার তৈরি হয়। অথচ আমাদের গোষ্ঠী অনুভূতি সবচেয়ে কম। পিজিটি মার খেলে ইন্টার্নরা নামবে না ইন্টার্নরা মার খেলে ফাইনাল ইয়ার বলবে আমাদের কী। মেডিক্যাল কলেজে কেউ মার খেলে এসএসকেএমের কিছু যায় আসে না, সেখানে কেউ মার খেলে বর্ধমানের আর কী। আমাদের শুধু নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীসংঘাত আছে। তাই না আমরা একটা কমিউনিটি হিসেবে একসঙ্গে লড়ার ক্ষমতা রাখি, না অন্য কোনো শ্রেণির, গোষ্ঠীর আমাদের লড়াইয়ের শরিক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় ন্যূনতম স্তরে। কেন মুভমেন্ট করব, কেন দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকব, তা জানিই না আমরা। কল্পনাই করতে পারি না এক-শো জন মিলে পাঁচদিন স্ট্রাইক করছি।

তাই আমরা মার খাব। আমি, তুমি, তুই, সে, আপনি, উনি মিলে মার খাব। কারণ আমরা মার খাওয়ার পেছনের শ্রেণি বুঝি না। সমাজচেতনা বুঝি না। মার খাওয়ার পরে একটা মুভমেন্ট কীভাবে হবে, কেন হবে, কী কী দাবিতে হবে তা বুঝি না। অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, শ্রেণিগতভাবে আমরা ক্ষুদ্র, অবুঝ, নির্লিপ্ত, দাম্ভিক এক কমিউনিটি। তাই আমরা মার খাব ততদিন পর্যন্ত, ততদিন ধরে, জনে জনে, প্রত্যেকে, আজ

ভোটকেন্দ্রের দেওয়ালের পেছনে আপনার শরীর, তার সুস্থতা, তার চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারগুলো বিক্রি হয়ে যায় স্বাস্থ্যবণিকদের হাতে

বা কাল যতদিন না আমরা শুধু ছোটা আর ছোটা ভুলে একটু সহজ হই, রাস্তায় নামি, কাঁধে কাঁধ মেলাই, হাতে হাত ধরি . . .

ততদিন পর্যন্ত বেথুন, কোটনিশ ও চে আমাদের মার খাওয়ায় হাসবে আড়াল থেকে। যারা লড়াইয়ের ইতিহাস জানে না, এই মুহূর্তে তাদের জন্য কোনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন নেই . . .

৪.

তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তিগত রাগটা হওয়া খুব স্বাভাবিক, আমার ওপর আপনার, এবং আপনার ওপর আমার। কিন্তু তাৎক্ষণিকতায় পৃথিবী চলে না, একটা ব্যবস্থা টিকে থাকে না। তাই সামগ্রিকতায় একটা ব্যবস্থাকে বোঝাপড়ার দায় থেকেই যায়, এবং সে দায় যেমন ডাক্তারের তেমনই একইরকমভাবে এবং একই পরিমাণে আপনারও বটে। শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্রর, বাসস্থানের মতোই স্বাস্থ্যও একটা বেসিক নাগরিক অধিকার; বেসিক মানে বিনামূল্যে সরকার তা দিতে বাধ্য থাকবে আপনাকে। না না, নিজের গাঁটের কড়ি খরচা করে নয় (সরকারের কোনো ম্যাজিক ঝোলা নেই যে তাতে টাকা তৈরি হয়, তার দরকারও নেই), আমার আপনার ট্যাক্সের টাকায়। কিন্তু সরকার এত ভদ্রলোক নয়, তার দায় আছে আপনার গলাতে নিজের শ্রীচরণটি দিয়ে সমস্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কর্পোরেটবাবুদের হাতে তুলে দেওয়ার। তাই প্রতিশ্রুতি ঝরে শরৎসকালে শিউলিফুলের মতো টুপটুপিয়ে, আপনারও

আহ্লাদে আটখানা পা বেরোয়, 'আহা, সরকার কত দরদি, আমায় কত ভালোবাসে' ভেবে চোখ থেকে জল ঝরে, ভোটের দিন সকালে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে লাইন করে দাঁড়ান। আর ভোটকেন্দ্রের দেওয়ালের পেছনে আপনার শরীর, তার সুস্থতা, তার চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারগুলো বিক্রি হয়ে যায় স্বাস্থ্যবণিকদের হাতে। দিনের শেষে আপনি এবং আপনার পাশে তামাম ভারতবাসী নিজস্বাস্থ্যের দাম মেটাতে নেমে আসেন দারিদ্রসীমার নীচে।

ডাক্তার এই স্বাস্থ্যব্যবস্থাটারই একজন পরিষেবা প্রদানকারী মাত্র, আপনি তাকেই দেখেন গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে আপনার ডানপাশ দিয়ে হেঁটে যেতে। কিন্তু তার একবার স্টেথো বসানোয় আপনার কাশি থামে না, জ্বর নামে না। আউটডোরে এলে আপনাকে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ল্যাবে প্রয়োজনীয় টেস্ট করাতে হয়, ওষুধ কিনে খেতে হয়, ওয়ার্ডে ভর্তি হলে সিস্টার-গ্রুপ ডি কর্মী-সুইপার-এর ওপর ভরসা করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাবে টেস্ট, পেটে ওষুধ। এই একটা জায়গাতেও ডাক্তার ব্যক্তিগতভাবে কোনো ভূমিকা রাখেন না। ইচ্ছে থাকলেও বহু জায়গায় পালন করতে হয় সাধারণ দর্শকের ভূমিকা। এটুকু সহজপাঠ না বুঝলে মুশকিল, এবং না বুঝে মস্তিষ্কের থেকে বাইসেপস বেশি চালালে আরও বেশি মুশকিল।

আবার স্নেহের ডাক্তার, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার, অবোধ্য-অ-বধ্য ডাক্তার— আপনি যদি দিনের পর দিন কাটমানি খান, পেশেন্টের সঙ্গে অমানুষের মতো ব্যবহার করেন, নিজ হস্টেল কোরবান শেখকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেন তাহলেও মুশকিল এবং সেটা সমূহ মুশকিল, কারণ ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের বিশ্বস্ততার জায়গায় প্রাথমিক সচেতনতার দায়টা আপনার বহন করার কথা ছিল। আপনি সেসব ভুলে খাওপিও-জিওতে ঢুকে বসে থাকলেন, 'ধুর, অত ভেবে কী হবে, নিজেরটা বোঝো' মন্ত্র আউড়ে শুধু সামাজিক সুবিধে নিলেন নিজের অবস্থানের। ফলে ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের সামগ্রিক অবক্ষয়ের দায় থেকে আপনিও মুক্ত হতে পারলেন না। রোগীর রোগটা বুঝিয়ে বলা, প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কমদামে পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে ওষুধ দেওয়ার কাজটাও আপনারই। অতএব যৌথভাবে যদি এই বোঝাপড়াটায় আসা যায় যে বাপেরও বাপ আছে এবং তারে সরকার বলে, তাহলে সন্তানসন্ততিদের মধ্যে এই ঝাড়পিটটা বন্ধ হয় আর কী। এবং আবারও মনে করানোর যে, সেই বোঝাপড়ার দায় ডাক্তারের মতো আপনারও। নয়তো আমাকে তাকে ওনাকে মেরে আপনারও রোগ সারবে না, অন্যদিকে রোগীকে ঘিরে ডাক্তারের অবিশ্বাসের মেঘও আরেকটু কালো হবে, ফলস্বরূপ আবার কখনো পেটাবেন আপনি। এই ঘূর্ণাবর্ত চলতেই থাকবে অনন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকারের আকাশে স্বাস্থ্যের রোদ ওঠানোর দায় নেব আমি, আপনি, আমরা। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. অনীক চক্রবর্তী, এমবিবিএস, একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যুক্ত আছেন শ্রমজীবী মানুষের জন্য চলা এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

Advt

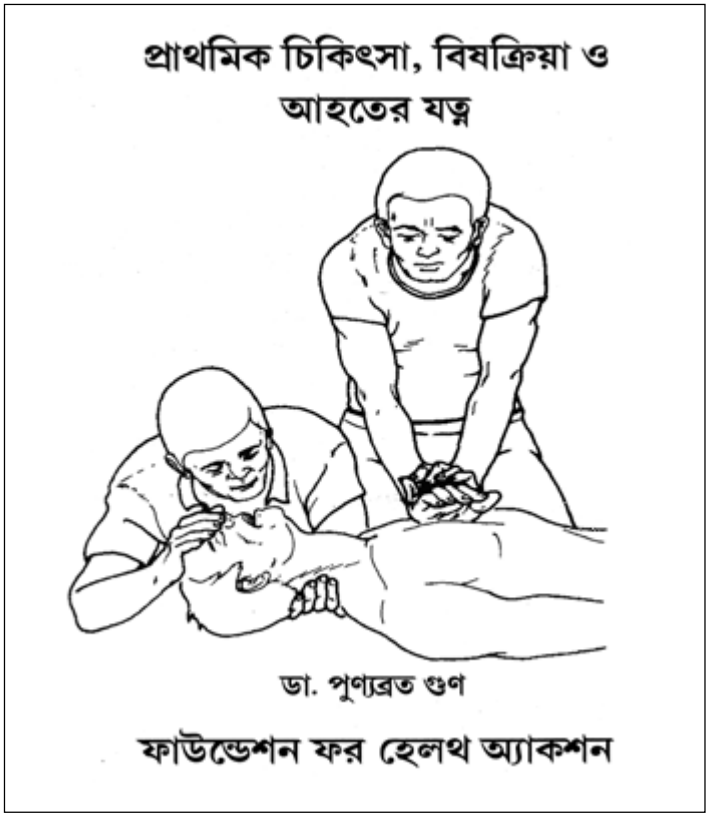

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.
P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

স্বাস্থ্যের বৃত্তের সাথীদের প্রতি আহ্বান

সারা দুনিয়ায় নানা দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য ও সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় তলানিতে। রোগী বা তাঁর পরিবারের নিজেদের খরচ (out of Pocket Expenditure) সর্বোচ্চ। প্রতি বছর ৫ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যান, চিকিৎসার খরচ মেটাতে।

অথচ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা নাগরিকের অধিকার। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত শ্রীনাথ রেড্ডি কমিটি সুপারিশ করেন সার্বজনীন নিঃশুল্ক চিকিৎসা পরিষেবার (Free Universal Health Care) বলবৎ করার— যা পৃথিবীতে বহু দেশেই বিদ্যমান। কিন্তু পুর্বতন ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারগুলি এই সরকারি কমিটির সুপারিশকেই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে—স্বাস্থ্যকে হয় সরাসরি বেসরকারি ক্ষেত্রে বিক্রির সামগ্রী করে তুলছে আর নয় স্বাস্থ্যবিমার ধোঁকার টাটি খাড়া করছে।

এর প্রতিবাদে ও সার্বজনীন পরিষেবার দাবিতে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর (শহিদ শংকর গুহ নিয়োগীর মৃত্যুদিন) থেকে আমরা প্রায় ছয় মাস ব্যাপী একটি প্রচার অভিযান ও জেলায় জেলায় স্বাস্থ্যজাঠার কর্মসূচি নিয়েছি—বিভিন্ন বিজ্ঞানক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন, সামাজিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে।

এই কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য এবং আপনার এলাকায় প্রচার কর্মসূচি (ঘরোয়া সভা, পথসভা, সেমিনার, মিছিল) সংগঠিত করার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

নিম্নলিখিত দাবিপত্রে এলাকার মানুষ, পরিচিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীদের স্বাক্ষর করিয়ে আমাদের পত্রিকার দপ্তরে এই ঠিকানায় পাঠান—শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ এইচ এ ৪৪, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯৭ (প্রয়োজনে সঙ্গে সাদা কাগজ সংযুক্ত করুন)।

দাবিপত্র

- সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলিতে সারা দেশে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করতে হবে।
- সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে সমস্ত জীবনদায়ী ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করতে হবে।
- দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বেসরকারি হাসপাতাল ও বিমা কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া চলবে না।
- শ্রমিকদের স্বার্থ ধ্বংস করে কর্মচারি রাজ্যবিমা নিগম (ESI)-কে ঐচ্ছিক (Optional) করা চলবে না।

নাম	ঠিকানা	দূরভাষ/চলভাষ	ই-মেল

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকার কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি

নাম	ঠিকানা	দূরভাষ/চলভাষ	ই-মেল